বঙ্গ কমলবার্তা

অমৃত কলসের খোঁজে

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা। ২০২৫

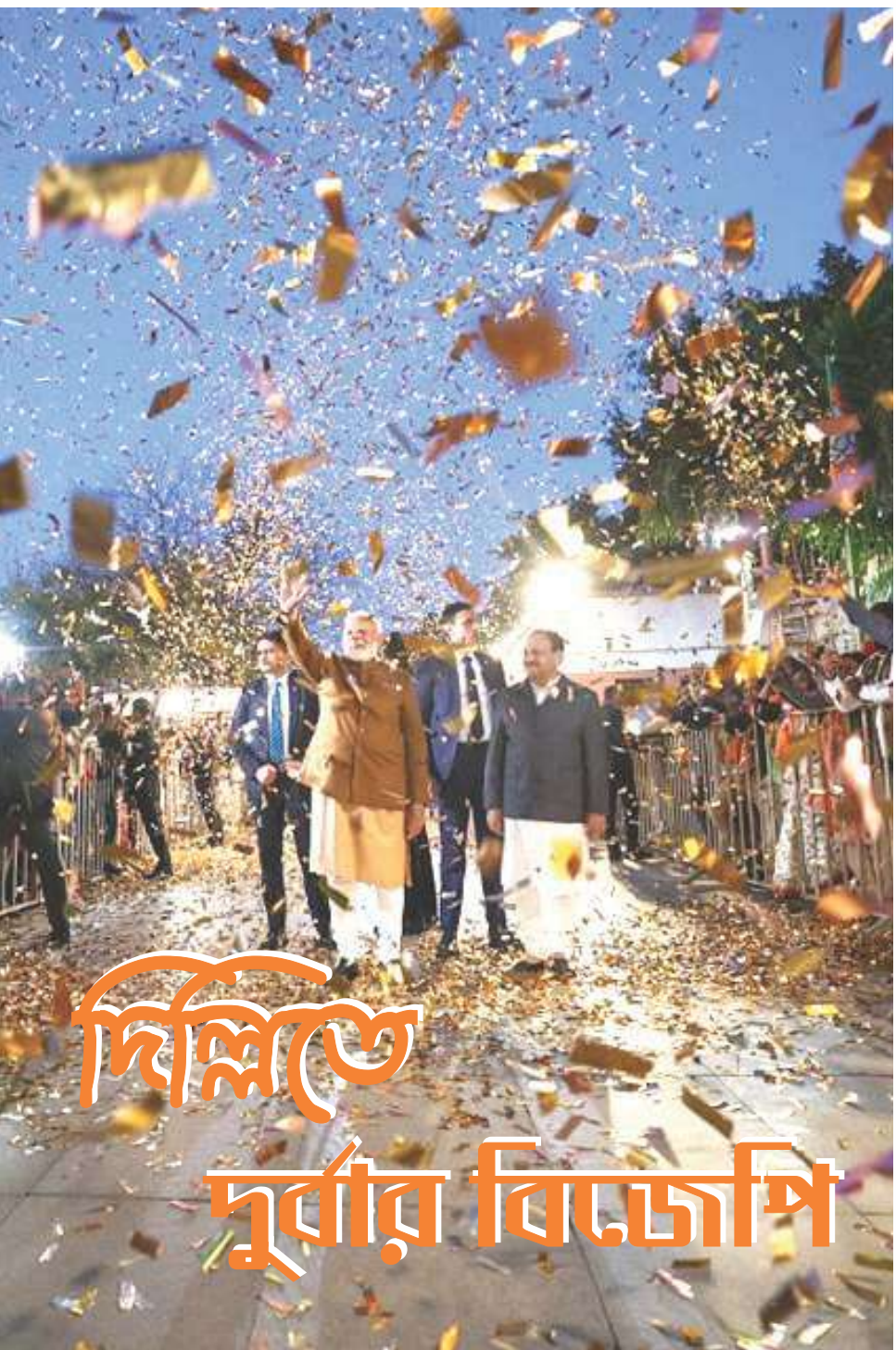

দিল্লিতে দুর্বার বিজেপি

আমেরিকা সফরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে
বিভিন্ন মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-র উষ্ণ অভ্যর্থনায়
ফ্রান্স সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লির আরকে পুরমের
জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনী জনসভায় বিজেপি
সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে শ্রী রাজনাথ সিং।

দিল্লি বিধানসভার রোহতাশ নগরে শ্রী অমিত শাহের
নির্বাচনী রোড শো-তে জনতার উচ্ছ্বাস।

বঙ্গ
কমলবার্তা
ফেব্রুয়ারি সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

দিল্লিতে দুর্বার বিজেপি ৬
সৌভিক দত্ত

মধ্যবিত্তের স্বপ্নের উড়ানঃ বাজেট ২০২৫ ৯
দিব্যেন্দু দালাল

অমৃত কলসের খোঁজে ১২
অভিরূপ ঘোষ

ছবিতে খবর ১৬

কমিউনিস্টদের সুভাষ প্রেম একটি ব্যর্থ রঙ্গ নাটক ২২
পুলক নারায়ণ ধর

দলিত মুসলিম ঐক্য এবং ডঃ আম্বেদকর ২৫
দেবতনু ভট্টাচার্য্য

বাঙালীর ভাষা প্রেম ২৮
কৌশিক কর্মকার

শিক্ষায় হতশ্রীঃ গর্বিত অনুপ্রেরণার পশ্চিমবঙ্গ ৩১
বিমল দাস

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

আপের 'ফ্রি ফ্রি ফ্রি'বাজার বা কংগ্রেসের 'ভালবাসার দোকান' কোনটাই কাজে লাগলো না। ইনিয়ে- বিনিয়ে- কেঁদে- ককিয়ে যোগেন্দ্র যাদবের অলীক তত্ত্বও ভোকাট্টা। পদ্মফুলেই আস্থা রাখল দিল্লির মানুষ। আস্থা রাখল নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টিতে। শিশমহলের কেজরি-ওয়ালকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে দিল্লি। মদ কেলেঙ্কারির নায়ক দিল্লির আপদা বা আপদ-কে ক্ষমা করেনি দিল্লি। দিল্লির আম আদমি ঝাড়ু মেরে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিগ্রস্থ কেজরি কোম্পানির সস্তা নাটক।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজের সঙ্কল্প নিয়ে যে দলের জন্ম হয়েছিল, সেই দলেরই মুখ্যমন্ত্রী কেজরি তাঁর ৪৫ কোটির শিশমহল তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন যখন গোটা দেশ লড়াই করছিল করোনার বিরুদ্ধে! দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখর এই সেই কেজরি যাকে আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যেতে হয়েছে, সঙ্গে তাঁর দুই দোসর মণীশ সিসোদিয়া এবং সত্যেন্দ্র জৈন। 'আপদা' দলের প্রথমসারির এই ৩ নেতাকেই ঝাড়ু মেরে যমুনার জলে ফেলে দিয়েছে দিল্লির মানুষ। শুধু দিল্লির মানুষ নয়, কেজরিকে ত্যাগ করেছে তাঁর রাজনৈতিক গুরুও। যে অন্না হাজারে- কে সামনে রেখে পরবর্তী সময়ে কেজরি এবং তাঁর মৌরসিপাট্টা, সেই অন্না জি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমি আগে থেকেই বলে আসছি, নির্বাচনের সময়ে প্রার্থীর আচরণ এবং ভাবনাচিন্তায় শুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য কোনও প্রার্থীর জীবন নিষ্কলঙ্ক হওয়া প্রয়োজন। তাঁর জীবনে ত্যাগ থাকা উচিত। কারও মধ্যে এই গুণগুলি থাকলে ভোটারদের মনে বিশ্বাস জন্মায়। আমি এ সব কথা বার বার বলেছি। কিন্তু তাঁর (কেজরীর) মাথায় এ সব প্রবেশ করেনি। তিনি বেশি গুরুত্ব দেন মদের উপর। কেন মদের দোকানের প্রসঙ্গ উঠল? কারণ, তিনি ধনদৌলতের মধ্যে বয়ে গিয়েছিলেন।"

আর এতটাই বয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর চোখেই পড়েনি তাঁরই গর্বের সরকারি স্কুল এবং মহল্লা ক্লিনিকের অন্তর্জলি যাত্রা। খয়রাতির রাজনীতি করতে করতে তাঁর চোখেই পড়েনি দিল্লির রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, নর্দমায় জমা জল, অপরিচ্ছন্ন আবর্জনার স্তূপ, অশুদ্ধ পানীয় জল এবং দূষিত দিল্লির বাতাস। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের মতই কেজরির দলের লোকেরা কোটি কোটি টাকা কামালেও উন্নয়নের আলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। যদিও বিলাসবহুল গাড়িতে ঘুরে বেরিয়েছেন একসময়ে দিল্লির মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের নয়নের মণি কেজরি।

দিল্লিতে বিজেপির এই জয় দুর্নীতি বনাম স্বচ্ছতার জয়। এই জয় মিথ্যা বনাম সত্যের জয়। এই জয় খয়রাতি বনাম সামগ্রিক উন্নতির জয়। এই জয় বিভাজিত হিন্দু সমাজের এক হওয়ার জয়। এই জয় নরেন্দ্র মোদীর প্রতি দিল্লির পূর্ণ আস্থার জয়। এই জয় দিল্লিতে আপের সঙ্গী 'পশ্চিমবঙ্গের পাপ' বিদায়ের আগে দিল্লির আপদ বিদায়ের জয়।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

"সালটা ১৯৯৯। কৃষ্ণনগরের কলেজ মাঠে মিটিং সেরে তিনি ঢুকলেন সার্কিট হাউসে। আমি সে বার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। দেখা করতে গেলাম। ঘরের ভিতরে সাংবাদিকদের ভিড়। সাংবাদিক সম্মেলন হবে। ঢুকতেই পরিচিত স্নিগ্ধ হাসিটা হেসে কাছে ডাকলেন। পাশে বসতে বললেন। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরে সেই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী সভা করতে এসেছেন তাঁর দলের প্রার্থীর হয়ে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শান্ত ভাবে। একেবারে শেষ দিকে আমার কাঁধে হাত দিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদের প্রার্থী'। সেই শুরু। তার পরে অনেক বার আমরা কাছাকাছি এসেছি। এক বছর পরে তাঁরই মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছি। খেতে খুব ভালবাসতেন অটলজি। মাঝে-মধ্যেই আমার ডাক পড়ত তাঁর বাড়িতে। খাওয়ার টেবিলে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা হত, রাজনীতি থেকে শুরু করে সরকারের নানা কর্মসূচি ও লক্ষ্য নিয়ে। উনি বেশি কথা বলতেন না, অল্প কথাতেই অনেকটা বুঝিয়ে দিতেন। এমনিতে নিরামিষ খেতে ভালবাসতেন। তবে ওঁর পালিত মেয়ের সঙ্গে বাঙালির বিয়ে হওয়ার কারণে বাঙালি খাবারেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন উনি।২০০৩ সালে অটলজির সঙ্গে তুর্কি গেলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী। মূর্তিটা তৈরি করেছিলেন আমাদের কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীর শিল্পী গৌতম পাল। সেখানকার একটা রাস্তারও নামকরণ করা হল রবীন্দ্রনাথের নামে। সেই সফরে সঙ্গে থেকে দেখেছি, সাহিত্যেও তাঁর কী দখল!"

– সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রয়াত বিজেপি সাংসদ, কৃষ্ণনগর।

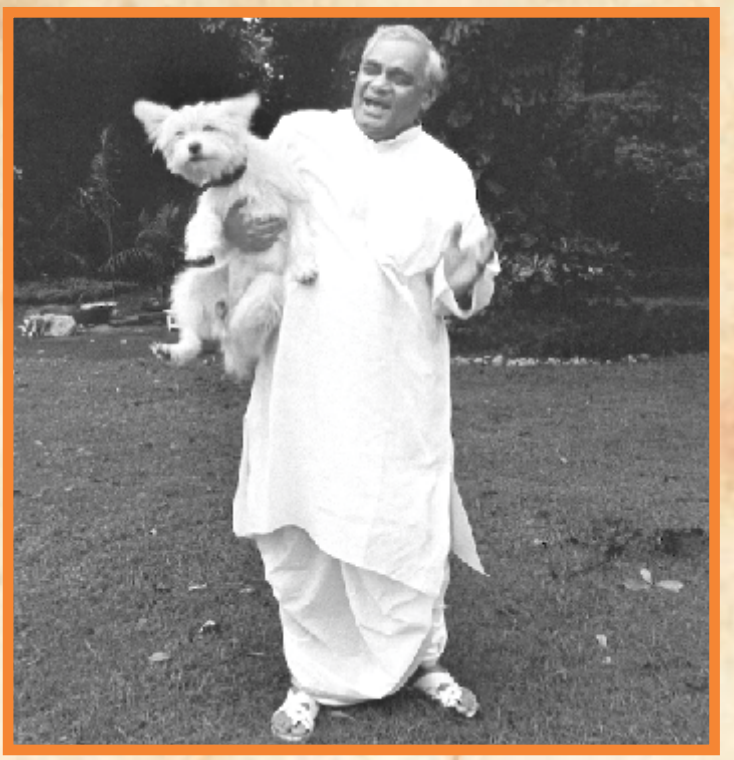

১৯৬২-র যুদ্ধে জেতার তিন বছর পর ভারতের এক তরুণ রাজনীতিকের বুদ্ধিমত্তা আর রসবোধের কাছে হেরে ভূত হয়েছিল চিন। দিল্লির সঙ্গে ফের পায়ে পা লাগিয়ে বিরোধ বাধানোর লক্ষ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভেড়া চুরির অভিযোগ এনেছিল বেজিং। তার জবাবে দিল্লির চিনা দূতাবাসে একটি ট্রাকে চাপিয়ে ৮০০টি ভেড়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জনসঙ্ঘের সেই সময়কার তরুণ তুর্কি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী। সেটা ১৯৬৫। তখন বাজপেয়ী জনসঙ্ঘের নেতা। ভেড়াগুলির গায়ে লেখা ছিল, "আমাদের খাও, কিন্তু যুদ্ধের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাও"। শান্তিকামী বাজপেয়ী বেজিংকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, অযথা ছল-ছুতোয় যুদ্ধ বাধানোটা উচিত হবে না।

দেশের সংসদে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার বহু গল্প আছে। অধুনা প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার পরে লোকসভায় প্রত্যেকটি দলের নেতারা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে। বিরোধী বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। একটু স্তব্ধতার পরে বলেন, "সোমনাথজি, আপনি বোলপুর থেকে এসেছেন। লেকিন— আভি আপকো বোলনা নেহি, জাদা শুননা পড়েগা!" গোটা সংসদ সে দিন হাসিতে ফেটে পড়েছিল! স্পিকারের চেয়ারে বসে হেসে ফেলেছিলেন সোমনাথবাবুও।

দিল্লিতে দুর্বার বিজেপি

রাজধানীতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার, পশ্চিমবঙ্গে কবে হবে?

সৌভিক দত্ত

আল-জাজিরার রাজনৈতিক বিশ্লেষক রশিদ কিদওয়াই-এর মতে, দিল্লি একটি মিনি ভারত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ সেখানে রয়েছেন - এবং বিজেপি দেখিয়েছে যে তারা যদি দিল্লি জিততে পারে তবে তারা যে কোনও নির্বাচন জিততে পারে।

মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ছত্তিশগড় সহ একের পর এক রাজ্যে নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার পর এবার খোদ রাজধানীই ২৭ বছর পর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনল বিজেপি। ৭০টি আসনের মধ্যে দিল্লিতে বিজেপির ৪৮ আর আপ পেলো মাত্র মাত্র ২২টি। ভেঙ্গে চুরমার দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের কেজরি-ওয়াল। অন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনকে শিখন্ডী বানিয়ে কেজরিওয়াল যখন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছিল তখন অনেকেই ভেবেছিল যে এবার হয়তো দিল্লিতে কংগ্রেসি দুর্নীতির জমানা শেষ হতে চলেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কংগ্রেসের থেকেও আরো বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠছে এই আম আদমি পার্টি। দিনে দিনে সমস্ত রকম দেশবিরোধী শক্তিদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠছিল দিল্লি।

এইতো বেশিদিন হয়নি, মাত্র পাঁচ বছর আগেই এরকমই এক ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দিল্লিতে থাকার সময়ই দেশের রাজধানীতে দাঙ্গা লাগানো হয় প্ল্যানমাফিক। গোটা এক সপ্তাহের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে ভারতের রাজধানী। সারা পৃথিবীর কাছে এক অশান্ত অস্থির ভারতের চিত্র তৈরি করে দেয় সেই সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিকল্পিত দাঙ্গা। আর সেই দাঙ্গাতেই ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর একজন অফিসারকে ৫১ বার কুপিয়ে খাজুরি নালাতে ফেলে দিয়েছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়। কোনও রাজ্যের সরকার ঠিক কতটা ভয়ংকর হলে সেখানে ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যায় এবং দাঙ্গার সময় তাদের হত্যা করা হয় সেটা ভেবে দেখা উচিত। সেই ৫১ খানা কোপ শুধু সেই অফিসারের শরীরের উপরেই পড়েনি, পড়েছিল কোটা ভারতবর্ষের উপরে, ভারতের নিরাপত্তা, স্বাভিমান ও সার্বভৌমত্বের উপরেও। আর শুধুই কি দাঙ্গা? কী ঘটেনি কেজরিওয়ালের শাসনকালে? শাহীনবাগে একটানা রাস্তা আটকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলা শার্জিল ইমামের চিকেনস নেক আলাদা করে দিয়ে ভারতকে দুইখণ্ড করে দেয়ার হুমকি, ইউনিভার্সিটিগুলোর ভেতরে আর্বান নকশালদের ক্ষমতাবৃদ্ধি, করোনার সময় ইচ্ছাকৃত জমায়েত করে রোগ ছড়ানোর চেষ্টা, পাঞ্জাবকে উত্তপ্ত করে রাখা, সেই পাঞ্জাবেই প্রধানমন্ত্রীর ওপরে আক্রমণের চেষ্টা, আবগারি দুর্নীতি, তথাকথিত আম আদমিদের মন্ত্রী হয়ে যাওয়ার পরে টাকার ভান্ডার উপচে পড়া, বেআইনি প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি ইত্যাদি

ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক কথাবার্তার সময় মাঝেমধ্যেই একটা কথা বহুল ব্যবহৃত হয় - পাপের ভাড়ার পূর্ণ হওয়া। দিল্লিতে কেজরিওয়ালের আক্ষরিক অর্থেই এটা হয়েছিল। অন্যায়ের পরিমাণ এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে তা ধারণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ছিল দিল্লির পক্ষে। আর তারই ফলাফল এই বিধানসভা নির্বাচন।

এ নির্বাচনে শুধু যে কেজরিওয়ালই হেরেছে তাই নয়, হেরেছে আম আদমি পার্টির সমস্ত বড় বড় নেতারাই। হেরেছে কেজরিওয়াল সহ তার সমস্ত ক্লোজ অ্যাসোসিয়েটরাই। শেষ তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে যে আসন থেকে কেজরিওয়ালই জিতে এসেছেন, সেই আসন থেকেই এবার জিতলেন বিজেপি প্রার্থী পরবেশ বর্মা। কেজরিওয়াল হারলেন ৪,০৮৯ ভোটে। যে খাজুরি নালাতে হত্যা করা হয়েছিল দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে, সেই এলাকাতে জিতেছে বিজেপির কপিল মিশ্র। দেশের মানুষ আসলে কি চায় তা এই খাজুরি নালাই প্রমাণ করে দিয়েছে। দিল্লিতে কেজরিওয়ালে হেরে যাওয়ার ফলে পাঞ্জাবও এবার অনেক শান্ত হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এছাড়াও এই নির্বাচনে অন্যতম বড় পাওনা হলো বিজেপির প্রতি দিল্লিবাসী বাঙ্গালীদের সর্বাত্মক সমর্থন। শেষ বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ একপ্রকার গলার কাঁটা হয়ে থেকে গেছে বিজেপির কাছে। প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ার পরেও এই রাজ্যের জটিল জনবিন্যাস ক্ষমতায় আসতে দেয়নি বিজেপিকে। কিন্তু দিল্লিতে প্রবাসী বাঙালিদের সমর্থন এইটা প্রমাণ করে দিল যে উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালিদের সমর্থন কোন দলের দিকে আছে।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিলোকপুরী, শকুরবস্তি, মঙ্গলপুরী, লক্ষ্মীনগরে বাঙালি ভোট ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব পান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এই সবকটিতেই এবার জিততেছে বিজেপি। বাঙালি ভোটার অধ্যুষিত বুথের মধ্যে ত্রিলোকপুরীতে ১২টির মধ্যে ১০টি জেতে বিজেপি, শকুরবস্তিতে ১৮টির মধ্যে ১৭টি জেতে বিজেপি,

মঙ্গলপুরীতে ১৫টির মধ্যে ১২টি জেতে বিজেপি, লক্ষ্মীনগরে ১০টির মধ্যে ১০টিই জেতে বিজেপি। অপরদিকে কালকাজি অল্প মার্জিনে হারলেও কালকাজির বাঙালি অধ্যুষিত এম ব্লক এলাকা থেকে প্রথমবারের জন্য লিড পেয়েছে বিজেপি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল মুস্তাফাবাদ। সেটা ৪০.৮% মুসলিম অধ্যুষিত আসন। বাঙালি ভোটার আছেন ২২টি বুথে। সেখানে ২২টি বাঙালি অধ্যুষিত বুথের মধ্যে ২১ টিতেই জয়লাভ করেছে বিজেপি। আপ-কে হারিয়ে আসনটি জিতে নিয়েছে বিজেপি।

দিল্লি নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পেছনে যে কারণগুলো প্রধান বলে মনে করা হচ্ছে তার মধ্যে প্রথমেই বলা উচিত নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের অপার আস্থা। যমুনার জল, দিল্লির দূষণ, আবগারি দুর্নীতি, শিশমহল এবং অনুন্নয়নের মতো ইস্যুতে জেরবার দিল্লিবাসী ভরসা রেখেছে নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত দিল্লি'-র গ্যারান্টিতে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথ সহ বিজেপির সমস্ত বড় নেতা থেকে শুরু করে একদম তৃণমূল স্তরের কর্মীরা পর্যন্ত। বিজেপির মাইক্রো ম্যানেজমেন্টও এই জয়ের অন্যতম কারিগর। যার জেরে বুথস্তরের কর্মী থেকে দলীয় নেতাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটিই প্রথম নির্বাচন যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বুথ কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাঁদের উৎসাহ দেন।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখেই অষ্টম পে কমিশনের ঘোষণাও বিজেপির জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ দিল্লিতে বিপুল সংখ্যক ভোটার সরকারি কর্মী। ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড়ও দিল্লিবাসী মধ্যবিত্তদের নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলী ভোটাররাও আপের থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে।

এই নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট বলছে, এ বছর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে মোট ৭২.৩৬ লক্ষ মহিলা ভোটারের মধ্যে ৪৪.০৮ লক্ষ ভোট

দিয়েছেন, যা মোট ভোটারের ৬০.৯ শতাংশ। এই হার পুরুষ ভোটারের (৬০.২%) তুলনায় সামান্য বেশি। ১৯৯৩–র পর এই বছর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক মহিলা ভোট দিয়েছিলেন।

তাছাড়াও কেজরিওয়ালের ধারাবাহিক দুর্নীতি এবং সে দুর্নীতি ঢাকার জন্য ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ইত্যাদিও মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল আপ এর প্রতি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর প্রাক্তন গুরু অন্না হাজারের গলাতেও শোনা গেছে সেই আক্ষেপ, "কংগ্রেস জমানায় যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনশন-লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সেই নীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছেন তিনি। তার ফলেই এমন পরাজয়। মদ বিক্রির দোকান দেওয়া এবং সেখান থেকে আসা বিপুল অর্থে ভেসে গিয়েছেন তিনি (কেজরি)"।

দিল্লির পাশাপাশি অযোধ্যার মিল্কিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনেও ইন্ডি জোটের শরিক সমাজবাদী পার্টিকে হারিয়ে প্রবল বিজয় এসেছে বিজেপির। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ফৈজাবাদ লোকসভায় হেরেছিল বিজেপি। ঘটনাচক্রে এই ফৈজাবাদ আসনের মধ্যেই আছে অযোধ্যা। কিন্তু লোকসভাটির জনবিন্যাস বিজেপির অনুকূলে নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেই লোকসভাতে হেরে যেতে হয়েছিল বিজেপিকে। এবং সেই হারকে বিকৃত করে, পুরো লোকসভাকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র অযোধ্যাতে বিজেপি হেরে গেছে বলে সারা দেশে জোর প্রচার চালিয়েছিল দেশবিরোধী মিডিয়া ও রাজনৈতিক শক্তিরা। মূল প্রতিপাদ্য অবশ্যই এটা ছিল যে রামমন্দির ভালোভাবে নেয়নি অযোধ্যাবাসী বা আরও সহজে বলতে গেলে, রাম মন্দির বানিয়ে বিজেপি ভালো কাজ করেনি। সেই নির্বাচনে বিজেপিকে মাত্র ৫৫ হাজার ভোটে ফৈজাবাদ হারাতে হয়েছিল সমাজবাদী পার্টির অবধেশ প্রসাদ এর কাছে। এবার সেই অবধেশেরই ছেড়ে যাওয়া গ্রামীণ অযোধ্যার বিধানসভা মিল্কিপুরের উপনির্বাচনে বিজেপি ৬১ হাজার ভোটে জিতছে। চরমভাবে পর্যদুস্থ হয়েছে সমাজবাদী পার্টি। বলা চলে এখানে ফৈজাবাদের প্রতিশোধ নিয়ে নিল অযোধ্যা।

অযোধ্যায় সপা এবং দিল্লিতে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় মুছে যাওয়ার অবস্থা। এই নিয়ে পরপর তিনবার দিল্লিতে শূন্য পেল কংগ্রেস। কোন সিটেই জয়ী হতে পারেনি তারা। মাত্র একটি আসন, কস্তুবা নগরে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে কংগ্রেস। কিন্তু তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম দুটি স্থানে প্রার্থীর থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে থাকতে হয়েছে তাদের। ওই দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান যতটা, মোটামুটি তত ভোটই পেয়েছে কাটা হাত। একইভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে কমিউনিস্টরাও। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, যে ছ'টি আসনে প্রার্থী

দিয়েছিল বামেরা, সেখানে তাদের ঝুলিতে ২,২৬৫ ভোট এসেছে। আর নোটার পক্ষে পড়েছে ৫,৬২৭ ভোট। শতাংশের নিরিখে বিচার করলে নোটার তুলনায় বামেরা ৬০ শতাংশের মতো কম ভোট পেয়েছে। শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ ভোট পেয়েছে সিপিআইএম। সিপিআইয়ের প্রাপ্ত ভোট হল ০.০১ শতাংশ। ০.৫৭ শতাংশ ভোট গিয়েছে নোটার ঝুলিতে। অর্থাৎ যে বামদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয় যে তারা নোটার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সেই নোটার কাছেও গোহারা হেরেছে লাল পার্টি। ভবিষ্যতের সুস্থ ভারতবর্ষের জন্য কংগ্রেস মুক্ত ও কমিউনিস্ট মুক্ত দিল্লি একটি অত্যন্ত শুভ চিহ্ন।

দিল্লি নির্বাচন নিয়ে শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীতেই উৎসাহ ছিল। যারা ভারত নিয়ে আগ্রহী বা ভারতের সাথে যাদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে এমন সবাই তাকিয়ে ছিল দিল্লির দিকে। নির্বাচনের পরেও বিভিন্ন সংবাদপত্র এই খবর বড় করে প্রকাশ করেছে। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) দিল্লিতে বিজেপির ক্ষমতায় ফিরে আসাকে 'বড় রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন' বলে অভিহিত করেছে। রয়টার্স বলেছে নির্বাচনের ফলাফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দলের জন্য একটি 'যুগান্তকারী বিজয়'। স্পেনের একটি প্রথম সারির সংবাদপত্র এল পাইস একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেছে, 'এল পার্টি দেল প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী, দিল্লি ডেসপুয়েস ডি কাসি ট্রেস ডেকাডাস' শিরোনামে। যার বাংলা করলে হয় 'প্রায় তিন দশক পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দল দিল্লিতে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে'। অন্যদিকে আল-জাজিরার রাজনৈতিক বিশ্লেষক রশিদ কিদওয়াই বলেছেন, দিল্লি একটি মিনি ভারত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ সেখানে রয়েছেন - এবং বিজেপি দেখিয়েছে যে তারা যদি দিল্লি জিততে পারে তবে তারা যে কোনও নির্বাচন জিততে পারে। আবার বিবিসির মতে বিজেপির কাছে দিল্লিকে সুরক্ষিত করা নির্বাচনী সাফল্যের চেয়েও বেশি কিছু।

সব মিলিয়ে বলা যায় বিজেপির দিল্লি জয় ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল বিজেপি কি দিল্লিতেই থেমে যাবে নাকি এবার পূর্ব দিকেও একটু তাকাবে। দিল্লির মতো শক্ত ঘাঁটি এবং মিনি ভারতকে যদি বিজেপি সন্ত্রাস ও অপশাসন মুক্ত করতে পারে তবে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করা কি খুবই কঠিন কিছু? এবার কি আসলেই পশ্চিমবঙ্গের পালা নতুন ভাবে জেগে ওঠার? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো সময়ের গর্ভেই লুকিয়ে আছে।

মধ্যবিত্তের স্বপ্নের উড়ান

বাজেট ২০২৫

দিব্যেন্দু দালাল

বাজেটে মধ্যবিত্তের চওড়া হাসি। বিরোধীদের শুকনো মুখ। কৃষক এবং আম নাগরিকের যখন উপচে পড়ছে আনন্দ, বিরোধীদের কপালে চিন্তার ভাজ তখন দীর্ঘতর হয়েছে। অথচ আমজনতার মুখে হাসি ফোটানো এই বাজেট তো সমর্থন করা উচিৎ ছিল প্রতিটি রাজনৈতিক দলের! নাকি তাঁরা মোদী সরকারকে বিরোধিতা করার সরেস (বা সোরোস) অভ্যাস ছেড়ে বেরোতে পারলেন না?

গত ১লা ফেব্রুয়ারি মাননীয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মল সীতারামন ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন। ওনার বিগত বাজেটগুলোর মতই এবারের বাজেটও হল দূরদর্শী এবং সংস্কারমুখী। ২০১৪ সালের পর কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার একের পর এক গনতান্ত্রিক সংস্কারের (structural reforms) মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছে। রাজস্ব ঘাটতির ওপর লাগাম রেখেও যে জনকল্যাণকর নীতি প্রণয়ন করা যায় তা গত দশ বছর ধরে প্রমাণ করে চলেছে মোদীজীর সুযোগ্য নেতৃত্ব। একদিকে যেমন আত্মনির্ভরতায় ক্রমশই বলীয়ান হয়ে উঠছে ভারতবর্ষ তেমন অন্যদিকে ভারত ক্রমেই আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা হয়ে উঠেছে। মেক ইন ইণ্ডিয়া নীতির মাধ্যমে স্বদেশী প্রযুক্তিতে তৈরী রপ্তানিযোগ্য প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম তৈরী হচ্ছে এবং গত দশ বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানী ২১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বা Foreign Direct Investment (FDI) রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে ভারতে পুঞ্জীভূত (cumulative) FDI ১ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইল ফলক স্পর্শ করেছে তার মধ্যে গত ১০ বছরের মধ্যে এসেছে প্রায় ৬৯ শতাংশ। এই সবই সম্ভব হয়েছে কারণ গত দশ বছরে মোদী সরকারের দুর্নীতিমুক্ত একটি স্বচ্ছ প্রশাসনের ফলে। ডিজিটাল লেনদেন অর্থনীতিতে দুর্নীতির সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়েছে এবং আজ ইউপিআই-এর পরিষেবার ফলে দূর দূরান্ত, দেশ-বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো এখন কয়েক সেকেন্ডের বিষয় হয়ে গেছে। গত দশ বছরে পরিকাঠামোর ওপর যে পরিমাণ জোর দেওয়া হয়েছে তা আগে কখনও হয়নি। অগণিত সুড়ঙ্গ, সেতু নির্মাণ করে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পৌঁছন অনেক দ্রুত ও সুবিধাজনক করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে কাশ্মীর, লেহ, লাদাখে যাওয়া আজ আর কঠিন নেই। নির্মিত হয়েছে পৃথিবীর উচ্চতম চেনাব রেলব্রিজ যা কাশ্মীরকে বাকি ভারতের রেললাইনের মাধ্যমে যুক্ত করেছে। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ এবং বিশ্বের দ্রুততম হারে বর্ধনশীল অর্থনীতি ২০৩০ সালে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এবার আসা যাক এবারের বাজেট প্রসঙ্গে। বস্তুত এবারের বাজেটের সবচেয়ে বড় চমক হল আয়করের ওপর ঐতিহাসিক ছাড় যা দীর্ঘদিন পর মধ্যবিত্তের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। অর্থমন্ত্রী শেষমেশ রেহাই দিলেন। তবে সেটা এমনভাবে করলেন যাতে বেশীরভাগ মানুষ নতুন কর ব্যবস্থার (New tax regime) আওতায় যেতে বাধ্য হয়। নতুন কর কাঠামোয় বেতনভোগী বর্গের বার্ষিক ১২.৭৫ লক্ষ টাকা আয়ে করের পরিমাণ শূন্য। এদিক থেকে সরকারের দু'টো সুবিধা হল। এক, পুরনো কর ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরে কর ছাড়ের পথগুলো বন্ধ হয়ে গেল। দুই, পুরনো কর ব্যবস্থায় 80C-তে যে সব savings করার একটা তাগিদ ছিল সেটা আর থাকলো না। ফলে করদাতারা এখন উদ্বৃত্ত অর্থ সেখানেই লগ্নি করবে যেখান থেকে তার return বেশী হবে। আরো পরিষ্কার করে বললে, এবার থেকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মত প্রকল্প যেখানে নিশ্চিত সুদ আছে সেখান থেকে শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফাণ্ডে লগ্নি, যেখানে ঝুঁকি

হয়তো আছে কিন্তু return অনেক বেশী সেখানেই টাকা রাখা শ্রেয় মনে করবে। অর্থনীতির পরিভাষায় সঞ্চয় যেখানে সার্বিক যোগান বা aggregate supply কে বাড়ায়, অন্যদিকে লগ্নি কিন্তু সার্বিক চাহিদা বা aggregate demand কে বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ, অর্থনীতিতে চাহিদাকে বৃদ্ধি করতে গেলে সঞ্চয় নয় লগ্নির ওপর জোর দিতে হবে। তবেই আর্থিক বৃদ্ধির পথে হাঁটা যাবে। বিগত কিছু বছরে মিউচুয়াল ফাণ্ড ও শেয়ার বাজারে খুচরো লগ্নিকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ফলে মার্কেট ক্যাপিটাল বা বাজারে পুঁজি অনেকটাই বেড়েছে যার সরাসরি ফল পাচ্ছে দেশের জিডিপির বৃদ্ধির হার। আরেকটা বিষয়, এই যে করছাড়ের সুবিধাভোগীদের হাতে যে টাকাটা বাঁচলো অর্থাৎ disposable income - এর যে বাড়তি টাকা এল সেটা যে তারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্থাৎ rationally খরচ করবেন যা আবার অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধি করে আর্থিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও অর্থমন্ত্রী নতুন আয়কর বিলের কথা ঘোষণা করেন এবং আগামী দিনে আয়কর ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে চলেছে তার একটা আগাম আভাস পাওয়া যাচ্ছে। টিডিএস – টিসিএস প্রণালীতে যুক্তিযুক্ত করতে প্রবীণ নাগরিকদের সুদ বাবদ আয় কর ছাড়ের পরিমাণ ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে টিডিএস-এর সীমা বছরে ২.৪ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। টিডিএস মতো টিসিএস প্রদানের ক্ষেত্রেও বিলম্ব এবার থেকে আর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

নাগরিকরা যাতে স্বেচ্ছায় কর দিতে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠেন সেজন্য মূল্যায়ন বর্ষের ভিত্তিতে আপডেটেড রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সময়সীমা ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৪ বছর করা হচ্ছে। আয়ের আপডেট বাবদ ৯০ লক্ষ করদাতা বাড়তি কর দিয়েছেন। আয়ের আপডেট বাবদ ৯০ লক্ষ করদাতা বাড়তি কর দিয়েছেন। ছোট সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তাদের নিবন্ধনের সময়সীমা ৫ থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করা হয়েছে। এছাড়াও করদাতারা এখন নিজের দখলে থাকা দুটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্য শূন্য বলে দাবি করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন শর্ত থাকছে না। গত বাজেটের বিবাদ থেকে বিশ্বাস কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। ৩৩ হাজার করদাতা এর সুযোগ নিয়েছেন। প্রবীণ এবং অতিপ্রবীণদের আরও সহায়তার লক্ষ্যে ২৯ আগস্ট ২০২৪ কিংবা তার পরে ন্যাশনাল সেভিংস স্কিম থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে করে রেহাই দেওয়া হবে। এনপিএস বাৎসল্য খাতার ক্ষেত্রেও একই সুবিধা পাওয়া যাবে। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়ার ফলে আগামী দিনে অর্থনীতিতে ভোগ্যপণ্যের চাহিদায় জোয়ার আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানব সম্পদের ওপর লগ্নিকরণ

ক্যানসার সমেত ছত্রিশটি জীবনদায়ী ওষুধের ওপর থেকে বেসিক কাস্টমস ডিউটি (BCD) সম্পূর্ণ ভাবে হটানো হয়েছে। রোগীদের বিনামূল্যে প্রদান করা হলে মেধাস্বত্ব সহায়তা কর্মসূচির আওতায় থাকা ১৩টি নতুন ওষুধে ভিত্তি সীমাশুল্ক কার্যকর হবে না।

জাতীয় স্তরে ১০,০০০ টি নতুন মেডিক্যাল সিট তৈরী করা হবে।

সরকারি স্কুলগুলিতে আগামী ৫ বছরে ৫০,০০০ অটল টিঙ্কারিং ল্যাব গড়ে তোলা হবে।

পরিকাঠামো ও উদ্ভাবন

'সিটিস অ্যাজ গ্রোথ হাবস'- সামগ্রিক ভাবে নগর বিকাশ এবং জল ও শৌচালয় পরিষেবা উন্নত করতে সরকার ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি তহবিল গড়ে তুলবে। উদ্ভাবন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে গবেষণার কাজে গতি আসবে এর ফলে।

অর্থমন্ত্রী ন্যাশনাল জিওস্প্যাশিয়াল মিশনের ঘোষণা করেছেন এ সংক্রান্ত পরিকাঠামো জোরদার করতে। এর থেকে পাওয়া তথ্যাদি নগর পরিকল্পনার কাজ সহজ করবে।

গবেষণা এবং উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে বরাদ্দ ২০,০০০ কোটি টাকা। ১ কোটি প্রাচীন লিপি ও লেখ সংরক্ষণে জ্ঞান ভারতম মিশনের ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সামিল হবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, এমনকি বেসরকারি পক্ষও। ভারতীয় জ্ঞান ধারার ভান্ডার নিয়ে গড়ে উঠবে একটি জাতীয় ডিজিটাল রেপোজেটরি। ডিপ টেকনোলজি ও এআই -এর ওপর গবেষণা ও বিকাশ ভারতকে উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে নিয়ে যাবে।

কৃষক হলেন আসল নায়ক

বাজেটে 'প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা'-র ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এর আওতায় আসবে ১০০টি জেলা। লক্ষ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বৈচিত্র্য, ফসল পরবর্তী মজুত ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি ঋণের সংস্থান সহজতর করা।

সূচনা হবে বহুক্ষেত্রিক 'গ্রামীণ সমৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতা' কর্মসূচির। রাজ্যগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই কর্মসূচির আওতায় দক্ষতায়ন, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের প্রসারের পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে গ্রামের মহিলা, তরুণ কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন পরিবারগুলিকে। সরকার ৬ বছরের "মিশন ফর আত্মনির্ভরতা ইন পালসেস" নামে একটি কর্মসূচি চালু করবে। এখানে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তুর, অড়হর এবং মুশুর ডালের ওপর। নাফেড এবং এনসিসিএফ-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা আগামী ৪ বছর কৃষকরা যতটা পরিমাণে এই সব ডাল বিক্রি করতে চান, ততটাই কিনে নেবে।

শাক-সব্জি এবং ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সার্বিক কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে বাজেটে। উচ্চফলনশীল শস্য বীজের জাতীয় মিশন এবং তুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ বছরের একটি বিশেষ কর্মসূচির কথাও বলা হয়েছে।

পুনর্মার্জিত সুদ রেহাই কর্মসূচির আওতায় কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণের উর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

ভারতের রপ্তানিতে ৪৫ শতাংশ অবদান এই ক্ষেত্রের। প্রযুক্তিগত বিকাশ, দক্ষতায়ন, মূলধনের সংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার নিরিখে এই সব সংস্থার আর্থিক আদান-প্রদানের সীমা আড়াই থেকে দুই গুণ বাড়ানো হয়েছে।

জামিনযুক্ত ঋণের উর্ধ্বসীমাও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

মহিলা, তপশিলি জাতি ও উপজাতি বর্গের ৫ লক্ষ নতুন উদ্যোগপতিকে সহায়তার জন্য অর্থমন্ত্রী একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এর আওতায় আগামী ৫ বছর ২ কোটি টাকা পর্যন্ত মেয়াদি ঋণ দেওয়া হবে।

খেলার সরঞ্জাম উৎপাদনে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ব্র্যান্ডকে বিশ্বের বাজারে আরও জনপ্রিয় করতে চায় সরকার। মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ছোট-বড় সব শিল্পকে আওতায় এনে সূচনা হবে জাতীয় উৎপাদন মিশনের।

প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' সাযুজ্য রেখেই এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এই বাজেট আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ ও সার্বিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন জিডিপি-র অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ নিম্নমুখী রাখতে সরকার সচেষ্ট। এক্ষেত্রে আগামী ৬ বছরের পরিকল্পনা রূপরেখা বিশদ ভাবে রয়েছে এফআরবিএম-এর বিবৃতিতে। পুনর্মার্জিত হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫-এ আর্থিক ঘাটতি জিডিপি-র ৪.৮ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা। ২০২৫-২৬-এর বাজেট হিসাব অনুযায়ী তা হতে পারে জিডিপি-র ৪.৪ শতাংশ। আর্থিক ঘাটতিকে আয়ত্তে রাখার ফলে মুদ্রাস্ফীতির ওপর লাগাম রাখাও সম্ভবপর হয়েছে এবং আগামী দিনে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্ব হ্রাস ও মানবিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটবে এমনটাই আশা করা যায়।

অমৃত কলসের খোঁজে

“পবিত্র সঙ্গমে স্নান করতে নেমেছিলাম জীবন যুদ্ধে প্রায় হেরে যাওয়া মধ্য বয়স্ক এক যুবক হয়ে। উঠে এলাম নতুন শক্তিতে ভরপুর এক লড়াকু কিশোর হিসাবে” — অভিরূপ ঘোষের কলমে বঙ্গ কমলবার্তার মহাকুম্ভ দর্শন।

"নমঃ পার্বতী পতয়ে, হর হর মহাদেব"

সমস্বরে মহাদেবের নাম নিয়ে আমরা ডুব দিলাম প্রয়াগ সঙ্গমে। না, এ স্নান শুধু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর পবিত্র মিলনস্থলে এক ধার্মিক ক্রিয়া নয়, মহাবিশ্বের এক আদি অনন্ত অপরিসীম শক্তির মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেসে যাওয়ার এক আধ্যাত্মিক ডুব এটা। পার্থিব শরীর থেকে স্নানের জল হয়তো শুকিয়ে যাবে কয়েক মিনিটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে ওই কয়েকটা ডুবেই এক অবিশ্বাস্য পজেটিভ এনার্জি মিশে গেছে শরীরের প্রতিটা কোষে। পবিত্র সঙ্গমে স্নান করতে নেমেছিলাম জীবন যুদ্ধে প্রায় হেরে যাওয়া মধ্য বয়স্ক

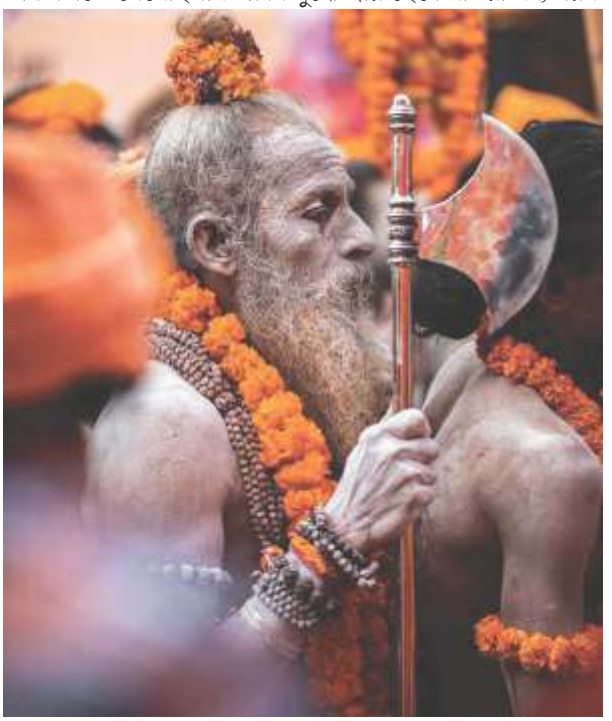

এক যুবক হয়ে। উঠে এলাম নতুন শক্তিতে ভরপুর এক লড়াকু কিশোর হিসাবে। মনে হচ্ছিল আমার শরীরে লেগে থাকা প্রতিটা জলের বিন্দু মহাজাগতিক শক্তির এক বিপুল ভান্ডার নিয়ে ঘিরে ধরেছে আমাকে। অবশিষ্ট জীবনে এ অনুভূতি ভোলার নয়।

স্নানঘাটের কিছুটা দূরেই লাইন দিয়ে পরপর অনেকগুলো অস্থায়ী চেঞ্জিং রুম। সেখানেই ভিজে জামাকাপড় বদলে বেরিয়ে এলাম। হাতে সময় বিশেষ ছিল না। এদিকে ঘোরার জায়গা অনেক। কিন্তু তবু ইচ্ছে হল না ওই জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে। বসে পড়লাম। সামনে লক্ষ লক্ষ জনতার স্রোত চলেছে সঙ্গমঘাটের দিকে। যেন ভেসে যেতে চাইছে ধর্ম, ইতিহাস,ঐতিহ্য,সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার অমৃত প্রবাহে। এটাই তো সেই ধার্মিক জায়গা যেখানে বারবার নতুন রূপে নতুন ভাবে ফুটে উঠেছে সনাতন - জন্ম হয়েছে সেদিনের আখারা পরিষদ থেকে আজকের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অব্দি অনেক কিছু। এইতো সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে সম্রাট হর্ষবর্ধন নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দিয়েছিলেন স্ব-ইচ্ছায় (৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। এটাই তো সেই ঐতিহ্যমন্ডিত মেলা যার উল্লেখ মেলে বায়ু পুরাণ, নারদ পুরাণ থেকে আরম্ভ করে তুলসীদাসজির রামচরিত মানস হয়ে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা ইংরেজ আধিকারিকের রিপোর্ট পর্যন্ত বহু জায়গায়। এটা তো সেই পৃষ্ঠভূমি যা বিদেশি শাসকদের শত আক্রমণ সত্বেও সনাতনী সংস্কৃতিকে শেষ হতে দেয়নি। সর্বোপরি এই তো সেই পবিত্র স্থান যেখানে জীবিত অবস্থাতেই নিজের এবং পরিবারের সকলের পিন্ডদান করে ধর্ম রক্ষার্থে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গী হয়ে নাগা হয়ে যান কিছু মহাত্মা।

নাগা সাধুরা কুম্ভ মেলার প্রাণ। পবিত্র সঙ্গমে সবার আগে অমৃতস্নান করার অধিকার নাগা সাধুদের। নাগা সাধুরা মানব সভ্যতার

ইতিহাসের এক জীবন্ত বিস্ময়। অদ্ভুত এদের সহ্যক্ষমতা। প্রবল তুষারপাতের মধ্যে এনারা ধ্যান করেন কোনোরকম পোশাক ছাড়াই। আবার লৌহতপ্ত আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যান অবলীলায়। এনারা কোথা থেকে কুম্ভে আসেন আর তারপর কোথায় চলে যান সে কথা কেউ জানে না। কোথায় থাকেন, কি খান বা কি করে সাধনা করেন সবটাই রহস্যে মোড়া। তবে ইতিহাস ঘাঁটলে এটা বোঝা যায় যখনই দেশ এবং ধর্মের উপর আক্রমণ নেমে এসেছে তখনই নিজেদের প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে বুক চিতিয়ে লড়েছেন এই নাগা সাধুরা। ঔরঙ্গজেব যখন কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরে হামলা করেছিল তখন নাগা সাধুদের একটা অংশ প্রবল চেষ্টা করেছিলেন তা আটকানোর। আবার আহমদ শাহ আবদালি যখন একে একে ধ্বংস করে দিচ্ছে মথুরা-বৃন্দাবন-গোকুল তখন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই নাগা সাধুরাই।

হাজার হাজার বছরের ফ্ল্যাশব্যাকে হারিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। সম্বিত ফিরল অভিজিতের ডাকে। ওরা ততক্ষণে সঙ্গমঘাট থেকে একটু দূরে সেক্টর ওয়ানে থাকার জায়গা ঠিক করে ফিরে এসেছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের জন আশ্রয় স্থল। ভাড়া একটা সিঙ্গেল বেড-

বালিশ-কম্বল সমেত দৈনিক ১০০ টাকা। ঠিক হল সঙ্গমের ঠিক পাশের অস্থায়ী পিপাপুল পেরিয়ে আমরা আগে যাবো সেক্টর উনিশ-কুড়ির দিকে। ওখানেই কোনও এক ভান্ডারাতে দুপুরের খাওয়ার খেয়ে একটু ঘুরে নেব আখাড়াগুলো। তারপর একেবারে রাতে লেজার শো দেখে ফিরে আসবো থাকার জায়গায়। যদিও মাত্র ৬-৭ ঘন্টায় ১৩টা আখাড়া (প্লাস এবারের নতুন সংযোজন কিন্নর আখাড়া) ঘোরা প্রায় অসম্ভব এক কাজ ছিল, তবু বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ছাড়া আমাদের হাতে অন্য কোন উপায়ও নেই।

আসলে আখাড়াগুলো সনাতনের স্তম্ভস্বরূপ। মনে করা হয় আদিগুরু শংকরাচার্য আজ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর আগে এগুলি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। যদিও কেউ কেউ মনে করেন আখাড়াগুলো আদতে আরও পুরনো। এই দীর্ঘ সময় ধরে সনাতনীদের সংগঠিত করা এবং হিন্দু ধর্মের উপর নেমে আসা সমস্ত আঘাত প্রতিরোধের চেষ্টা করে চলেছে আখাড়াগুলো। সমস্ত নাগা সাধু ছাড়াও বিভিন্ন সন্ন্যাসী এবং সাধুরা এই আখাড়াগুলোর অধীনে থেকে ধর্মরক্ষার কাজ করে চলে। বহু শত বছর আগের বিদেশি মরু আক্রমণ প্রতিরোধ থেকে আরম্ভ করে আজকের রাম জন্মভূমি আন্দোলন পর্যন্ত সবটাই এনাদের কৃতিত্ব। আর আখাড়াগুলোর সদস্যসংখ্যাও বেশ কম নয়। ৪-৫ লক্ষ নাগা সাধু থেকে আরম্ভ করে লক্ষ লক্ষ সন্ত সন্ন্যাসী এবং কয়েক কোটি সদস্য থাকে এক একটা আখাড়ার অধীনে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এদের অবস্থান হলেও কুম্ভমেলায় আখাড়াগুলো মিলিত হয় প্রতিবার। তাই একসাথে এত কাছে গোটা ভারতের সনাতনী সমাজের প্রতিনিধিদের দেখার সুযোগ মেলে কুম্ভে। আমরাও যথারীতি সে সুযোগ হারাতে চাইনি।

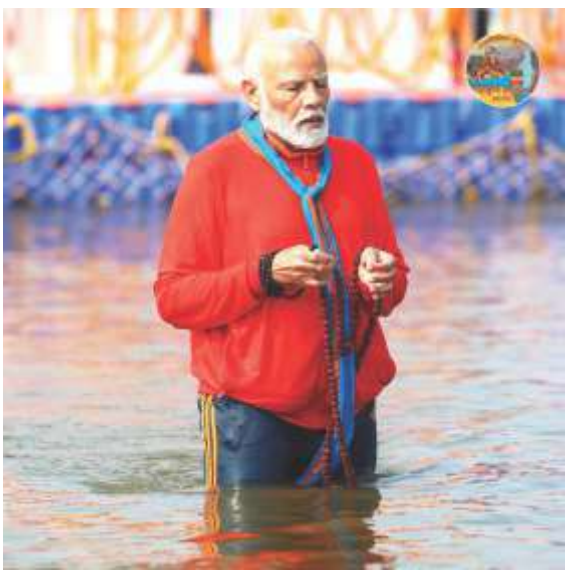

মহাকুম্ভ স্নানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মাত্র পাঁচটা আখাড়া ঘুরতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যার কুম্ভ মনোমুগ্ধকর। মেলা চত্বরে লক্ষ লক্ষ আলো জ্বলছে। যতদূর চোখ যায় শুধু ওই আলোর রেখা। এদিকে লেজার শো শুরু হয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে। আকাশে লেজার শোয়ের মাধ্যমে কুম্ভের ইতিহাস এবং গুরুত্ব দেখানোর এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করেছিল যোগী সরকার। প্রায় পৌনে এক ঘন্টা চলে সেই অনন্য লেজার শো। শো শেষে আমরা টেন্ট ফেরার পথ ধরলাম। রাস্তায় দেখলাম এক জায়গায় ভান্ডারা চলছে। রাতের খাবার সেখানেই খেয়ে নিলাম। খাওয়া সাঙ্গ হলে বুঝলাম শরীর মহাশয় এবার রণে ভঙ্গ দিতে চাইছেন। এখানে আমার অবাক হবার কিছু ছিল না। বরং আমার মত অলস বাঙালি ছেলে কোন আশ্চর্য জাদুবলে গোটা দিনে ১৫ কিলোমিটার হেঁটে ফেললো মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে, সেটাই আশ্চর্যের। ভাবলাম একটু বসে জিড়িয়ে নিই। বসার জায়গা খুঁজছি এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে নাম ধরে ডাকল কেউ একটা। ঘুরে দেখি সুনীলবাবু। সুনীল বাবু ট্রেনে আমার সহযাত্রী ছিলেন। ভদ্রলোক ঘোষিত বামপন্থী, বাড়ি সন্তোষপুর। গিন্নির জোরাজুরিতে কুম্ভ এসেছেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আমার সামনে সিটেই ছিল ওনাদের জায়গা। যদিও একদম শেষ মুহূর্ত ছাড়া কথাবার্তা বিশেষ হয়নি। সেসময় বিনা পয়সার জ্ঞান দিয়ে ফিরেছি। ভাবলাম এবার না প্রতিশোধ নিয়ে নেন আমার ক্লান্তি দেখে।

**

'কি! ফিজিক্স পড়ান! তবু কুম্ভ যাচ্ছেন!'

অপার বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন উল্টোদিকের সিটে বসে থাকা সুনীলবাবু। ট্রেন তখন প্রয়াগরাজ স্টেশন ঢুকছে। নামার জন্য উঠতেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু বসে গেলাম আবার। উত্তরটা দেওয়া দরকার। কারণ হিন্দুদের একটা বড় অংশ আজও জানে না সনাতন মানেই বিজ্ঞান। সূর্যের চারিদিকে বৃহস্পতির ঘুরতে লাগে ১২ বছর - পশ্চিমি বিজ্ঞানীরা এ সত্য আবিষ্কার করার অনেক আগে থেকেই কিভাবে পৃথিবী,সূর্য এবং বৃহস্পতির এক অসামান্য সামঞ্জস্য হিসাব রেখে কুম্ভমেলা করে আসছে সনাতনী সমাজ বা সূর্য,পৃথিবী,চন্দ্র এবং অন্য আরো অনেকগুলি গ্রহ উপগ্রহের পরপর চলে আসার সন্ধিক্ষণে কিভাবে মৌনি আমাবস্যা বিশেষ গুরুত্ব ধারণ করে কিংবা গ্রহ নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থান সমুদ্র-নদীর মতো কিভাবে আমাদের শরীরেও প্রভাব ফেলে তা ভদ্রলোককে বোঝানোর চেষ্টা করলাম অতি দ্রুত। এত তাড়াতাড়ি বলায় ভদ্রলোক কতটা বুঝলেন জানি না, তবে নামার আগে সুনীলবাবুর নাম্বার নিয়ে নিলাম। কিছু সনাতনী সাধু সন্তের ডিগ্রি পাঠানো দরকার ওনাকে। বোঝানো দরকার শিক্ষিত লোকজনের একটা অংশ কোনা কোনো ধর্মে সন্ত্রাসী হয় আর সনাতনে সন্ন্যাসী।

যাক নামলাম প্রয়াগরাজ স্টেশনে। সত্যি বলতে কি একটু ভয় ভয় করছিল। আমাদের থাকার জায়গা ঠিক নেই, কোথায় খাওয়া দাওয়া করবো তারও নিশ্চয়তা কিছু নেই। এদিকে দিনে দিনে ভিড় রেকর্ড ছাড়াচ্ছে। পেপারে পড়ছিলাম ২০১৩ সালে যেখানে ৫৫ দিনে মোট ১২ কোটি মানুষ স্নান করেছেন কুম্ভে সেখানে এবছর প্রথম তিন

সপ্তাহেই সংখ্যাটা ইতিমধ্যে ৩৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। একই জায়গা, একই পরিবেশ অথচ চার পাঁচ গুণ ভিড়! এদিকে আবার ট্রেনের এক ভদ্রলোক বলছিলেন যে ওভার ব্রিজটা দিয়ে স্টেশন থেকে আমাদের বাইরে বেরোতে হবে সেটাই নাকি গত কুম্ভে (২০১৩) ভেঙে গিয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। দুরুদুরু বুকে সেই ব্রিজটা দিয়েই বেরিয়ে এলাম বাইরে। স্টেশনের বাইরে এসে বুঝলাম আমার ভুল অমূলক এবং এটা ২০১৩ নয়। ঝাঁ চকচকে পরিসর, অসাধারণ সব ওয়াল পেইন্টিং, সাজানো-গোছানো বাগান আর সদাব্যস্ত পুলিশি ব্যবস্থা থেকে মনে হচ্ছিল আমরা বোধহয় কোন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে চলে এসেছি। ওই কথায় বলে না morning shows the day! শুধু স্টেশন চত্বর দেখেই আমরা বুঝতে পারছিলাম নিশ্চিতভাবে অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। দেরি করার অবকাশ আমাদের ছিল না। একটু এগিয়েই সামনের বড় রাস্তা থেকে সাতজনের জন্য দুটো অটো ভাড়া করে নিলাম আমরা। একটায় আমরা চারজন, অন্যটায় তিনজন। ড্রাইভারের ঠিক পাশের সিট আমার বরাবরের পছন্দ। আমি আগে ওটা দখল করে নিলাম।

অটোর ড্রাইভার সুরজদা বেশ মিশুকে। ওঠার সাথে সাথেই গল্প শুরু করে দিলেন আমার সাথে। জানতে চাইলেন কোথা থেকে আসছি। উত্তর দিলাম, 'কলকাতা'।

- প্রপার কোলকাত্তা!

- নেহি, মতলব সে থোড়া দূর। আপ শাহেদ নেহি পহচানেঙ্গে।

- আরে বাতাইয়ে তো সহি।

- ওহ কোলকাত্তা সে তোরা দূর। বর্ধমান নাম কে এক জিলা হে - ওহি সে।

- কোন সা বর্ধমান! পূরব ইয়া পশ্চিম!

বেশ অবাক হলাম। উত্তর দিলাম - পূরব।

- আরে মালুম হে। চাউল ওর আলু হোতা হে বহুত উধার।

- মতলব আপ গেয়ে থে উধার!

- আরে নাহি নাহি জি। পিছলে বিশ দিনো মে কম সে কম শ বার বাঙ্গালী লোগো কো লেকে গেয়া মেলা তক। বহুত কুছ জান লিয়ে বাঙ্গাল কে বারে মে।

- বিশ দিন মে সির্ফ বাঙ্গালী শ!

- হ্যাঁ জি। বাঙ্গালী বহুত আহ রাহে হে ইশ বার। লাগতা হে আপ লোগো কে অন্দর ছুপা হুয়া হিন্দু জাগ গ্যায়া জি।

ভুল বলেন নি সুরজ দা। গোটা দেশের সাথে সাথে এ রাজ্যেও হিন্দুত্বের নবজাগরণ ঘটিয়েছে এবারের কুম্ভমেলা। অন্তত মেলা প্রাঙ্গণ আর সোশ্যাল মিডিয়া সে কথারই প্রমাণ দেয়।

অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে বলছেন কুম্ভ স্নান করতে গেলে স্টেশন বা বাসস্ট্যান্ড থেকে পুরোটা হাঁটতে হবে। কথাটা আংশিক সত্যি। অমৃত স্নানের দিনগুলিতে অস্বাভাবিক ভিড়কে মাথায় রেখে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হলেও অন্য দিন ততটা কড়াকড়ি থাকছিল না। যেমন আমরা গিয়েছিলাম বসন্ত পঞ্চমীর দু'দিন পরে। সেদিন আমাদের অটো যেখানে আটকানো হল সেখান থেকে পবিত্র সঙ্গমস্থলের দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও কম। নেমেই হাঁটতে শুরু করে দিলাম আমরা। ঠিক ছিল আগে স্নান তারপর অন্য কিছু। স্নানের ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার কথা প্রথমেই বলেছি।

***

কুম্ভ মেলার অদ্ভুত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিখে শেষ করার নয়। এদিকে স্থান সীমিত। তাই বাকিটুকু জমিয়ে রাখলাম মনের মনিকোঠায়। তবে একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা না বললেই নয়।

কুম্ভ থেকে ফিরে আসার পর দিনই ফোন পেলাম সুনীলবাবুর। আজীবন নাস্তিকতায় বিশ্বাসী ভদ্রলোক তিন কুড়ি পেরিয়ে সনাতনের অমৃত কুম্ভ খুঁজে পেয়েছেন প্রয়াগরাজে। এবারের মহাকুম্ভ আবার ঘুরে আসবে ১৪৪ বছর পর। সেটা দেখা আর সম্ভব নয়। কিন্তু পূর্ণ কুম্ভ হবে ১২ বছর পর এবং অর্ধ কুম্ভ ৬ বছর পর। জানালেন, বেঁচে থাকলে যে কোন মূল্যে তিনি আবার যাবেন কুম্ভে।

আসলে এটাই এবারের কুম্ভ মেলার আসল সাফল্য। আস্তিক-নাস্তিক-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান-শিখ-জৈন সবাইকে সনাতনী ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তহীন অমৃতের সন্ধান দিতে পেরেছে এবারের প্রয়াগরাজ।

ছবিতে খবর

বিজেপির দিল্লি দখলের আনন্দে দিল্লির বাসভবনে বিজয় উৎসব পালনে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক সাফল্যের পর বিজয় উৎসব উদযাপনে
জেলায় জেলায় শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ পর্যন্ত সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ।

কল্যাণী শহরে অবৈধ বাজি কারখানা বিস্ফোরণে প্রাণহানির পর বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর।

দিল্লি বিধানসভায় বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের পর জেলায় জেলার সকল স্তরের কার্যকর্তা ও কর্মী সমর্থকদের বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল।

ছবিতে খবর

বিষাক্ত স্যালাইনে প্রসূতি মা এবং শিশু মৃত্যুর ঘটনায় অপদার্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।

অযোধ্যায় মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের ভব্য রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নন্দীগ্রামে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কলকাতায় সংগঠন পর্ব বিশেষ কর্মশালায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

বিজেপি উঃ পশ্চিম কলকাতার প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির এক্সিকিউটিভ সদস্য স্বর্গীয় ভাওয়ার লাল মুন্দ্রা জীর স্মরণসভায় রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব।

আরজিকর অভয়ার বাড়িতে ওঁনার বাবা-মায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি পরিদর্শনে রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য্য।

কলকাতায় বিজেপির সদর দপ্তরে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (পঃবঃ) প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও বিজেপি (পঃবঃ) প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক স্বর্গীয় অনিন্দ্য গোপাল মিত্র'র স্মরণসভায় রাজ্য নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

কলকাতায় বিজেপি কার্যালয়ে বাগদেবীর আরাধনায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

মুরলিধর সেন লেনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী ও পরাক্রম দিবস উদযাপনে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

সিউড়ি বিধানসভার সক্রিয় সদস্যদের সঙ্গে সহভোজে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর

রাজবংশী ভাষায় রামায়ণ লিখে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত নগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বাসভবনে শুভেচ্ছা জানাতে বিজেপি শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল ও জেলা নেতৃত্ব।

কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচিত বক্তৃতা সংকলন উন্মোচন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা মহাশয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু'র জন্মদিবসে জেলায় জেলায় বিজেপি কার্যকর্তা সহ সাধারণ মানুষের 'পরাক্রম দিবস' পালন।

৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মালদহ বৈষ্ণবনগরের সুকদেবপুরে রাষ্ট্রবাদী জনগণের সঙ্গে তিরঙ্গা যাত্রায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

উত্তর দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলার দুর্লভপুরে "সংবিধান গৌরব অভিযান" অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

জেলায় জেলায় ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

মেদিনীপুর বিধানসভার ২৭৪ নম্বর বুথের বুথ সমিতি নির্বাচন বৈঠকে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্মানীয় বিজেপি নেতা শ্রী দিলীপ ঘোষ ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

মেদিনীপুর হাসপাতালের স্যালাইন কান্ডে প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে, বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নাগরিক প্রতিবাদ মিছিল।

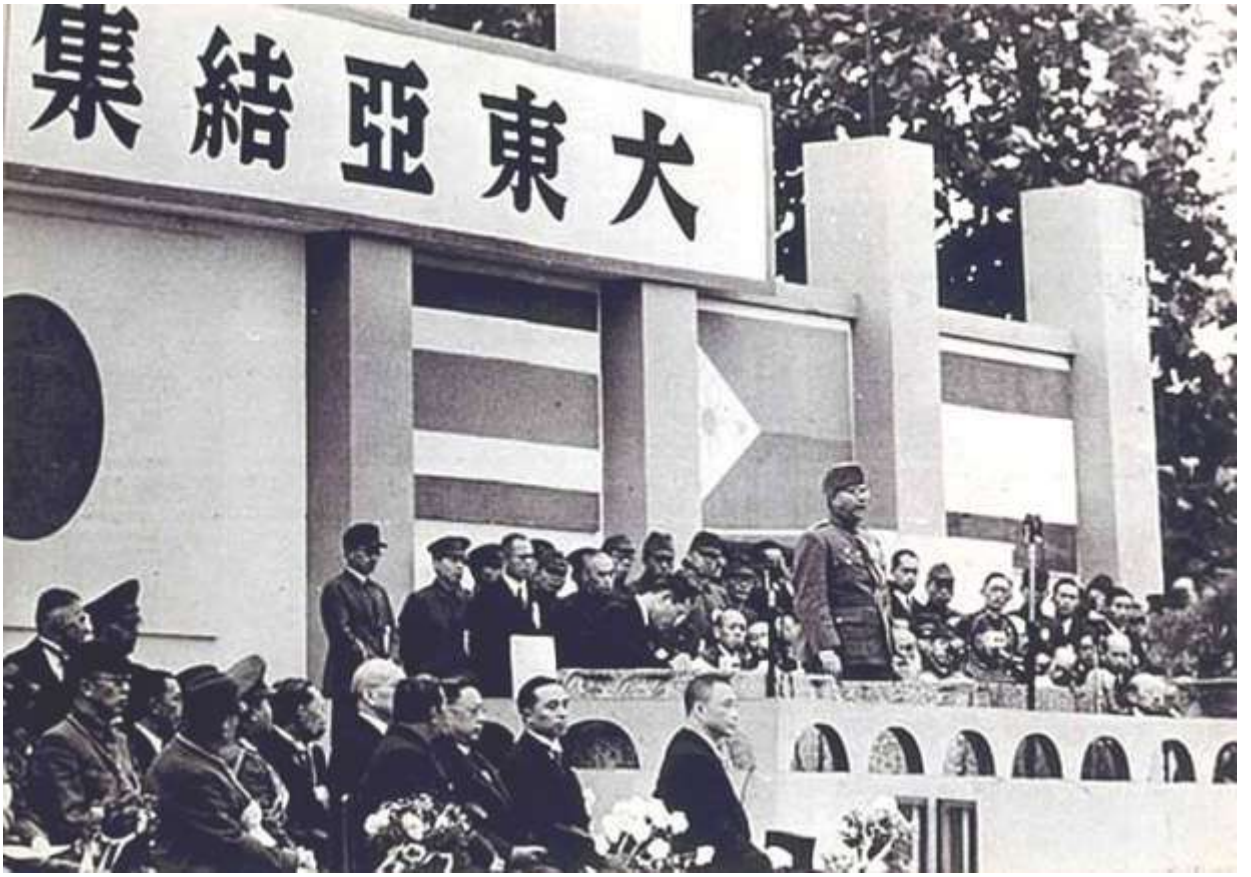

কমিউনিস্টদের সুভাষ প্রেম
একটি ব্যর্থ রঙ্গ নাটক

পুলক নারায়ণ ধর

আজ যে কমিউনিস্টরা নেতাজীর জন্মদিনকে 'দেশপ্রেম দিবস' করতে চাইছেন, সেই নেতাজীকে কুইসলিং, তোজোর কুকুর, হিটলারের তল্পিবাহক ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে নেতাজি সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানোর অপচেষ্টার শ্রেষ্ঠ কারিগর তো এঁরাই ছিলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি অত সহজে করা সম্ভব?

কলকাতা 'পোর্টের' নামকরণ হল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট। এর ফলে যার পর নাই কুপিত হয়েছে সিপিএম। কারণ সুভাষচন্দ্র বসুর নামকরণ হলেই তা উপযুক্ত হত বলে তাঁদের বক্তব্য। সুভাষচন্দ্র বা নেতাজী সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের প্রেম ও সম্মানবোধ যে এত মহান তা জানা ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষতেই ইতিহাসের পাতায় নেতাজী প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের ধারণা ও ক্রিয়াকলাপের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তাঁরা যাই বলুন, একটা অস্বস্তিতে তাঁরা ভোগেন। কারণ যখনই সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখনই তাঁদের পুরনো কাসুন্দি মনে পড়ে। মাঝে মাঝেই তাঁদের পূর্বকৃত ভুলের (?) জন্য নানা ব্যাখ্যা দিতে হয়। কিন্তু এই ভুল ও সুভাষ বিরোধিতা তাতে ঢাকা পড়ে না। সুভাষচন্দ্রকে তাদের দলভুক্ত করার একটা প্রয়াস তাঁদের প্রথম দিকে ছিল। ভারতীয় রাজনীতির এমন ঝকঝকে 'ক্যারিসমা'র ব্যক্তিত্বতে আগ্রহ ছিল 'আন্তর্জাতিক' কমিউনিস্টপন্থীদের। কিন্তু গান্ধী বনাম সুভাষ দ্বন্দ্বে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁরা কাউকেই পাবেন না।

কারণ দু'জনেই গভীরভাবে ভারতীয় 'ট্রাডিশন' ও সভ্যতার মানুষ। এই 'সভ্যতা' একেবারেই এদের কাছে 'বেমানান'। তাই ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে অন্যপথ ধরতে হল। সুভাষ হলেন এদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এই ভাবনাই সরলপথে সুভাষচন্দ্রকে 'ফ্যাসিবাদী' বলে বর্ণনা করে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁরা জনসানসে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রসের অধিবেশনে গান্ধীর বিরোধিতায় বাম চিন্তা ভাবনা পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে সময় সুভাষচন্দ্রকে ব্যবহার করে গান্ধীর একছত্র আধিপত্য খর্ব করার কৌশল অবলম্বন করেন।

সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও বিপ্লবী কৌশল গান্ধী অনুমোদন করেননি। কংগ্রেসের রাজনীতিতে দুই মেরুর অবস্থান কমিউনিস্টদের উৎসাহিত করে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মস্কো ও পেট্রোগ্রেডে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে (নভেম্বর ৭- ডিসেম্বর ৩) যে ৫ জন ভারতীয়কে আমন্ত্রণ জানানো (১৯২২) হয়েছিল সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এই সম্মেলনে যোগ দেননি। সে সময় ভারতের মাটিতে কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্মই হয়নি (কোন হিসেবে আজ একশো বছর পূর্তি হচ্ছে সেটাও প্রশ্ন)।

১৯২৮ সাল। কমিউনিস্টরা স্তালিনের তত্ত্বে মজে আছেন। কমিউনিস্টদের ভরকেন্দ্র 'কমিনটার্ন'। কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে উগ্রবাদী কর্মসূচি গৃহিত হয়। সেই সম্মেলনে এম.এন.রায় ভারতের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে পাতি বুর্জোয়ারা দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বিপ্লবী ঐক্যে আবদ্ধ হচ্ছে ও অন্যটি ফ্যাসিবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসরমান। ওরা বুঝতে পারলেন, সুভাষচন্দ্র অন্য ধাতুতে তৈরি মানুষ। তাঁকে দিয়ে হাঁটুমুড়ে স্তালিন বন্দনা করানো যাবে না। সুভাষচন্দ্রের মতো 'বুর্জোয়া' নেতা ও তাঁর

জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজোর হাতে দড়িতে বাঁধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, 'পিপলস ওয়ার', ১৯জুলাই ১৯৪২।

তৈরি দল 'ফরোয়ার্ড ব্লকের' বিরোধিতা করাই বিপ্লবীদের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট সুহৃদ বাক্যবাগীশ জওহরলাল নেহরু (কমিউনিস্ট হীরেন মুখোপাধ্যায়ের কথায় যিনি 'Gentle Colosus') এদের এককাঠি ওপরে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'সুভাষ যদি জাপানীদের নিয়ে ভারতে ঢোকে তবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করব।' পরে অবশ্য সুভাষের প্রতি জনসমর্থনের কল্লোল দেখে বন্দুক ফেলে কালো গাউন পরিধান করে লালকেল্লায় সুভাষ বাহিনীর পক্ষে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু গান্ধীর নির্দেশে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি অসহযোগিতার পথ নিল। ত্রিপুরি কংগ্রেস (মার্চ ১৯৩৯) লম্বা চওড়া কথা বলা 'সোশালিস্ট'-রা 'নিরপেক্ষ' বনে গেলেন। কমিউনিস্টরাও গান্ধীর নেতৃত্বে 'ঐক্যের' ধুয়ো তুলে সাধু হয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের পাশ থেকে মুশিক দল দ্রুত সরে গিয়ে গান্ধীর গণকীর্তনে নেমে গেলেন। কমিউনিস্টদের মুখপাত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' লিখল, তারা চায় 'not the exclusive leadership of one wing but a united leadership under the guidance of Gandhi' (মার্চ ১৯, ১৯৩৯)। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে পার্টির হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন দলের সে সময় মুষ্টিমেয় সদস্যদের মধ্যেও ধন্ধের সৃষ্টি করল। কমিউনিস্ট নেতা অজয় ঘোষের কথায় তা পরিষ্কার Did not the communists follow a tallest policy through the (Tripuri) session? Did they not in their eagerness for unity vacillate at every step? এমন কী তাঁর মতে, কমিউনিস্টরা তাদের 'মৌলিক নীতি' ও বিসর্জন দিয়েছেন গান্ধীর লেজুর বৃত্তি করে।

১৯৩৯ সালে 'Left Consolidation Committee' তে তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লককে 'প্রতিবিপ্লবী' বলে যে তকমা আগেই দিয়েছিল, তা প্রত্যাহার করতেও অস্বীকার করে। গান্ধী কংগ্রেসের ভেতর এই ধরণের

নেতাজীকে তোজোর কুকুর থেকে কুইসলিং - নানা তকমা দিয়েছিল কমিউনিস্টরা।

কমিটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে কমিউনিস্টরা কাল বিলম্ব না করে সুভাষের বা বামদের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করে 'গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে মঞ্চ বদলে ফেলল।

সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্টদের এই ধরনের অবস্থান ও চরিত্রের বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন 'Left Consolidation Committee' কে কমিউনিস্টরা শুধু তাদের সংগঠনকেই জনপ্রিয় করে তোলার কাজে ব্যবহার করেছে ও ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে কুৎসিৎ অপপ্রচার করেছে। 'Today they have cast of all some of shame' (দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯৩৫-১৯৪২)।

কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিক ব্রাত্য তথা প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখপত্রে কমরেড কোচারিয়ামটিস ভারতীয় কমউনিস্টদের এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি অনুমোদন করেন।

এদিকে স্তালিনের সঙ্গে করা 'অন্যক্রমণ চুক্তি' লঙ্ঘন করে হিটলার হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে বসলে কমিউনিস্টরা গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেন ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদেরই সহযোগী হয়ে ওঠেন। সুভাষচন্দ্র তার আগেই দেশ ছেড়ে অন্তর্হিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ভারত অভিমুখে এগোচ্ছেন। এই ঘটনায় কমিউনিস্টরা প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা দ্রুত তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করে ফতোয়া দিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে প্রতিহত করার কারণ তিনি ফ্যাসিবাদের চর। তিনি 'তোজোর কুকুর'। তোজোর হাতে লাগাম ও সেই লাগামে কুকুরের দেহে নেতাজীর মুখ এইরকম কুৎসিত ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হল তাঁদের দলীয় মুখপত্রে। নেতাজীকে তাঁরা তোজোর গাধা বলেও ব্যঙ্গ করলেন। তখনকার কমিউনিস্ট মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকার যে ছবি মুদ্রিত হ'ল।

সিপিআই (এম) নেতা জ্যোতি বসুর আত্মজীবনী যত দূর মনে পড়ে (১৯৯৮)

বইতেও জনযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে সাতকাহন থাকলেও সুভাষচন্দ্রকে তাঁর মনেই পড়ল না। ৪৫৮ পৃষ্ঠার বইটিতে কোথাও সুভাষচন্দ্রের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। সুভাষচন্দ্রের সঠিক মূল্যায়ন ও তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কমিউনিস্টরা যদি বিচার করতে বসেন, তবে তাঁদের বিপাকেই পড়তে হবে। কারণ নানাভাবে সুভাষচন্দ্রকে হেয় করার প্রচেষ্টায় তাঁরা কীভাবে সচেষ্ট ছিলেন সেই কাহিনীই উদ্ঘাটিত হবে। যেমন ১৯২৯ সালে নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন কক্ষেই হৈ হট্টগোল বাধা দান ও বাইরে থেকে গুন্ডা আনিয়ে (যা আজকাল ভোটের সময় হয়) হামলা করে সভা পন্ড করা এসব লিখিত ইতিহাস। এই দলে ছিলেন বঙ্কিম মুখ্যার্জী ও বি.টি. রণদিভের মতো মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা গুরুতর বিপদ স্বরূপ। তাঁদের সামনে থেকে

যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে আসবে, তা হতে পারে না। ...মিস্টার দেশপান্ডের দৃষ্টিতে আমাদের একটাই অপরাধ, আমরা মস্কোর হুকুম তামিল করতে অপারগ।

কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধের তত্ত্ব, সুভাষচন্দ্রকে 'কুইসলিং' গাধা, তোজোর কুকুর প্রভৃতি অপপ্রচার জনগণ সে সময় ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কমিউনিস্টরাই বরং ইংরেজের সাগরেদ হয়ে নানা জায়গায় হেনস্থা হচ্ছিল। সেই সময় তাঁরা তাঁদের ভুল স্বীকার করেননি। আজ প্রায় ৫০ বছর পর তাদের অনেক নেতাকেই বলতে শোনা যাচ্ছে, তাঁরা নাকি সে সময় ভুল করেছিলেন। নেতাজীকে তাঁরা নাকি দেশেপ্রমিক বলেই মনে করেন (এইরকম একটি প্রশংসাপত্র পেয়ে নেতাজী নিশ্চয়ই ধন্য হলেন)। নেতাজীকে নিয়ে এই ভুলের বোঝা তাঁরা বহুদিন ধরে বহন করেছেন।

প্রশ্ন হল, এ বিষয়ে পার্টির কোনো ফোরামে বা সম্মেলনে আলোচনা কবে হ'ল। এই ভুলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই বা কী? কোন তাত্ত্বিক নেতার তত্ত্ব সাধনায় এত বড় ভুলভুলাইয়তে তাঁরা এতদিন ঘুরে মরলেন? একের পর এক ভুলের নাগরদোলায় চেপে তাঁরা যে দেশের ক্ষতি সাধন করেছেন তার ব্যাখ্যা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে! দেশবাসী তা জানতে চায় আসলে কমিউনিস্টরা মেঠো বক্তৃতাতেই এই ভুলের কথা ভাসা ভাসা ভাবে বলে পার পেতে চায়। জনগণ ও ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেননি।

পারবেন কমিউনিস্টরা ইতিহাসের মুখোমুখি হতে। নেতাজী সম্বন্ধে কমিউনিস্টরা কোনো যথার্থ ও শ্রদ্ধাসূচক মূল্যায়ন আজও কী করেছেন? এমন কী নেতাজীর মৃত্যু রহস্য উদঘাটনে সর্বস্তরে যে তথ্য গোপনের চক্রান্ত বহমান সেক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমিকা খুবই সন্দেহজনক। এ নিয়ে তাদের মুখে কুলুপ আঁটা। কোন ভয় তাঁদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আজ হঠাৎ 'মরকের ইঁদুরের' মতো তাঁরা শ্যামাপ্রসাদকে নস্যাৎ করতে সুভাষপন্থী সেজে উঠেছেন। এ বড় রঙ্গ।

দলিত মুসলিম ঐক্য এবং ডঃ আম্বেদকর

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

দলিত মুসলিম ঐক্য নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ফাঁদে পা দিলেও প্রগাঢ় পন্ডিত এবং সেই সময়ের দলিত সমাজের অবিসংবাদী নেতা ডঃ আম্বেদকর মুসলমানদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার পরিণাম কি হতে পারে তা আগাম উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর অনুগামীদের বারে বারে এই পথে না এগোনোর জন্য সতর্ক করেছিলেন। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল যে মুসলমানদের সাথে অমুসলমানের ঐক্য বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়।

দলিত মুসলিম ঐক্যের স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে যোগদান করার পরে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা তাঁর পদত্যাগ পত্রটি পড়লেই যে কেউ আজ জানতে পারেন। তিনি পদত্যাগ পত্রে লিখেছিলেন, "…দীর্ঘ বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে পাকিস্তান হিন্দুদের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। এখানে তাদের ভবিষ্যত হল ধর্মান্তরিত হওয়া অথবা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। উচ্চ বংশীয় এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই এর মধ্যে পূর্ব বাংলা ছেড়ে গেছে। যেসকল অভিশপ্ত হিন্দু পাকিস্তানে থেকে যাবে আমার আশঙ্কা ধীরে ধীরে পরিকল্পনামাফিক তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হবে নয়ত ধ্বংস করে দেওয়া হবে"। এটাই ছিল দলিত মুসলিম ঐক্যের বাস্তবতা। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এই ফাঁদে পা দিলেও প্রগাঢ় পন্ডিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, দূরদর্শী মূকনায়ক, সেই সময়ের দলিত সমাজের অবিসংবাদী নেতা ডঃ আম্বেদকর মুসলমানদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার পরিণাম কি হতে পারে তা আগাম উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর অনুগামীদের বারে বারে এই পথে না এগোনোর জন্য সতর্ক করেছিলেন। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল যে মুসলমানদের সাথে অমুসলমানের ঐক্য বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়।

হিন্দু সমাজ তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয়নি। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব (কংগ্রেস) তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয় নি। অভিমানী ডঃ আম্বেদকর ১৯৩৫ সালে ঘোষণা করেন, "আমি হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি কিন্তু হিন্দু হয়ে মরবো না"। সাথে সাথে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়ে অনেকেই। পোপ তাঁর প্রতিনিধি পাঠান বাবাসাহেবের কাছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু বাবাসাহেব তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। ২১ বছর বর্ণহিন্দুদের বোধোদয় হওয়ার অপেক্ষায় থাকার পর অবশেষে ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর নাগপুরের কাছে অবস্থিত চন্দ্রপুরে তিন লক্ষাধিক অনুগামীকে সাথে নিয়ে তিনি বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন।

ডঃ আম্বেদকর যদি সেইদিন ইসলাম অথবা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতেন তাহলে ভারতের বর্তমান মানচিত্র আজকে হয়তো অন্যরকম হতো। হয়তো ভারতের মধ্যে তৈরি হত আরও কয়েকটি ছোট ছোট

মহাস্থবির চন্দ্রমণি-র কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন ডঃ আম্বেদকর এবং তার স্ত্রী, নাগপুর, ১৪ অক্টোবর ১৯৫৬।

পাকিস্তান, সাথে সাথে ভারত ভেঙে হয়তো তৈরি হত একটি পবিত্র খ্রীস্টান দেশও! আম্বেদকর তা চাননি। তিনি বলেছিলেন, "ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে আমার দলিত ভাইয়েরা ভারতের জাতীয় মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যাবে। তারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে গেলে ভারতে মুসলমানের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে এবং মুসলিম আধিপত্যের বিপদও বাস্তবে পরিণত হবে"।(Dhananjay Keer Dr. Ambedkar: Life and Mission. Popular Prakashan. pp. 280–. ISBN 978-81-7154-237-6.)

তাঁর স্পষ্ট মত ছিল যে হিন্দু এবং মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি এবং এই দুই জাতি অতীতে কখনোই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতের ইতিহাসে এমন কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা আছে যা নিয়ে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই যৌথভাবে গৌরবান্বিত হয়েছে অথবা যৌথভাবে অপমানিত হয়েছে? (Pakistan or Partition of India Page-41)

তিনি ভারতে একের পর এক মুসলিম আক্রমণ এবং মুসলিম শাসনকালে হিন্দুদের উপরে সার্বিক নির্যাতন, অপমানের ঘটনার উদাহরণ সামনে তুলে ধরেছেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন হিন্দু এবং মুসলমান সুদীর্ঘ সময় ধরে ভারতের মাটিতে দুটি যুদ্ধরত জাতি। এদের অতীত হচ্ছে পারস্পরিক ধ্বংসের ইতিহাস, পারস্পরিক শত্রুতার ইতিহাস (Pakistan or Partition of India Page-41)। এই প্রসঙ্গে তিনি ভাই পরমানন্দ প্রকাশিত একটি হ্যান্ডবিল, 'The Hindu National Movement' এর উল্লেখ করেছেন-"In history the Hindus revere the memory of Prithvi Raj, Pratap, Shivaji and Beragi Bir, who fought for the honour and freedom of this land (against the Muslims), while the Mahomedans look upon the invaders of India, like Muhammad Bin Qasim and rulers like Aurangzeb as their National heroes." ইতিহাসে হিন্দুরা পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ, শিবাজী এবং বান্দা বৈরাগী বীরের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করে, যারা এই ভূখণ্ডের সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা মুহম্মদ বিন কাসিমের মত বিদেশী আক্রমণকারী এবং আওরঙ্গজেবের মত ধর্মান্ধ মুসলিম শাসকদের জাতীয় বীর হিসেবে মান্যতা দিয়ে থাকে।

বাবাসাহেব এর সাথে যুক্ত করছেন, "ধার্মিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা প্রেরণা গ্রহণ করে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা থেকে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের প্রেরণার উৎস হচ্ছে কোরান এবং হাদীস। এইভাবে দেখা যায় যে বিষয়গুলি হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেগুলি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সূত্রগুলির তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী।" (Pakistan or Partition of India, Page-42)।

এই কারণেই বাবাসাহেব প্রশ্ন তুলেছেন, "যে হিন্দুরা ভারতে ঐক্যবোধকে ধ্বংস করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন, তারা প্রথমে সুনিশ্চিত করুক, যে ঐক্যের কথা তারা বলছেন বাস্তবে তার অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না।" (Pakistan or Partition of India, Page-56), ভারতে মুসলমান আক্রমণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলছেন, "ভারতে মুসলিম আক্রমণ শুধুমাত্র লুঠপাট করার লোভ অথবা শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য হয় নি। এর পিছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল.....নিঃসন্দেহে এই সব অভিযানের পিছনে ছিল হিন্দুদের মূর্তিপূজা এবং বহুদেবতার উপাসনার প্রথাকে ধ্বংস করে ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা" (Pakistan or Partition of India, Page-58)।

তিনি বলেছেন, "হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এই ব্যর্থতার প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি হয়েছে তা নিছক বিবিধতার কারণে নয়। হিন্দু মুসলমানের এই বৈরিতার সম্পর্ক বস্তুগত কারণে হয় নি। এই অনৈক্যের আসল কারণ ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিদ্বেষ এবং এই রাজনৈতিক বিদ্বেষ শুধুমাত্র এসবের একটি প্রতিফলন"(Pakistan or Partition of India, Chapter XII)।

দীক্ষা শেষে ভাষণ দিচ্ছেন ডঃ আম্বেদকর, ১৪ অক্টোবর ১৯৫৬।

ডঃ আম্বেদকরের দৃষ্টিতে, "যারা বাস্তববাদী, তাদের অবশ্যই এই সত্যটি লক্ষ্য করতে হবে যে মুসলমানরা হিন্দুদেরকে কাফের হিসাবে দেখে, যাদের বেঁচে থাকারই অধিকার নেই। একজন বাস্তববাদীকে অবশ্যই এই সত্যটিও লক্ষ্য করতে হবে যে মুসলমানরা ইউরোপীয়দের তাদের চাইতে উচ্চতর হিসাবে মেনে নিলেও একজন হিন্দুকে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট হিসাবে দেখেন। (Pakistan or Partition of India, Page-120)।

এই প্রসঙ্গে তিনি সাভারকারকে উদ্ধৃত করেছেন, "কোনো বাস্তববাদী ব্যক্তি এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারে না যে বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং ভারতকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে যে গোপন তাগিদ লালিত পালিত হচ্ছে, তা যে কোনো সময় স্বশাসিত ভারতে একটি গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে অথবা বিদেশী আক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারতের মুসলমানেরা দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিদেশী আক্রমণকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে একটা বিপর্যয় ঘটাতে পারে"(Pakistan or Partition of India, Page-163)।

ডঃ আম্বেদকরের এই আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিল না। তখন ভারতে একদিকে চলছে খিলাফত আন্দোলন, অন্যদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে চলছে অসহযোগ। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছেন গান্ধীজী। কিন্তু গান্ধীজীর স্বরাজের স্বপ্নের থেকে মুসলমানদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল খিলাফতকে বাঁচানো। এই পরিস্থিতিতে ভারতের খিলাফতিরা আফগানিস্তানের কাছে ভারত আক্রমণের আবেদন জানালো। গান্ধীজী আফগানিস্তানের আমিরকে বৃটিশ সরকারের সাথে কোনও চুক্তি না করার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বললেন, "আফগানিস্তানের আমীর যদি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে আমি এক অর্থে তাকে অবশ্যই সহায়তা করব। অর্থাৎ, আমি আমার দেশবাসীকে খোলাখুলি বলব যে, যে সরকার(বৃটিশ) ক্ষমতায় থাকার জন্য জাতির আস্থা হারিয়েছে তাকে সাহায্য করা অপরাধ"(Pakistan or Partition of India, Page-186)। এই প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের প্রশ্ন, "কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য এই পর্যন্ত যেতে পারে?"

আম্বেদকর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মানুষের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব নয়। এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব। মুসলমানদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্ব আছে, কিন্তু এর সুবিধা মুসলিম সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুসলিম সমাজের বাইরে যারা আছেন তাদের কাছে অবজ্ঞা ও শত্রুতা ছাড়া কিছুই নেই"। (Pakistan or Partition of India, Chapter XII)।

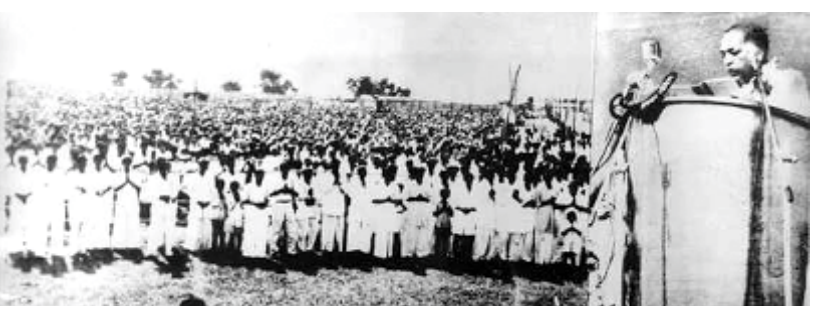

নাগপুরে অসংখ্য অনুগামীকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন ডঃ আম্বেদকর, ১৪ অক্টোবর ১৯৫৬।

ডঃ আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানদের সাথে অমুসলমানের ঐক্য, এমন কি নিছক সহাবস্থানও সম্ভব নয়। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল, "হিন্দুদের এই ধারণা ব্যর্থ হতে বাধ্য যে একদিন হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হয়ে একটি জাতিতে পরিণত হবে। এই ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখার অর্থ হল দিবাস্বপ্ন দেখা। ভরতের মুসলমানদের নিজেরা একত্রিত থাকার ইচ্ছা যতটা প্রবল, হিন্দুদের সাথে মিলেমিশে থাকার ইচ্ছার ততটাই অভাব"। - আম্বেদকর রচনা সম্ভার, খন্ড-১৫, প্রকাশকঃ ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন।

এই জন্যই তিনি তাঁর অনুগামীদের সতর্ক করে বলেছিলেন, "আমি সকল তফসিলি জাতির মানুষকে বলবো, মুসলিম সম্প্রদায় বা মুসলিম লীগের উপরে ভরসা করলে সর্বনাশ হবে" – Writings & speeches, vol: 17, part 1, Dr. Ambedkar Foundation, page-367 বাস্তববাদী আম্বেদকর সাহেব জানতেন ঐক্য কখনোই সম্ভব নয়। তাই তিনি চেয়েছিলেন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ জন বিনিময় হোক। তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তান সৃষ্টি হলেই হিন্দুস্থানে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না। সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে পাকিস্তানকে সমশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করা যায়, কিন্তু হিন্দুস্থান একটি মিশ্র রাষ্ট্র হিসেবেই থেকে যাবে। সারা হিন্দুস্থানে মুসলমানেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সীমানা পুনর্বন্টন করলে এ দেশ সমশ্রেণীভুক্ত হবে না। হিন্দুস্থানকে সমশ্রেণীভুক্ত করতে হলে একমাত্র পথ জন বিনিময়। সেটা না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুস্থানে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সমস্যা আগের মতই থাকবে এবং হিন্দুস্থানের রাজনীতির মধ্যে অনৈক্য চলতেই থাকবে"। - আম্বেদকর রচনা সম্ভার, খন্ড-১৫, প্রকাশকঃ ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন।

দলিত মুসলিম ঐক্যের ফেরিওয়ালারা আজকাল এই ডঃ আম্বেদকরকে সামনে রেখেই তাদের ভুয়ো মাল বিক্রি করছেন। সবাইকে অনুরোধ করবো দলিত-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিন এবং প্রান্তিক মানুষদের হিন্দু বিরোধী, ভারত বিরোধী চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে সতর্ক করুন।

বাঙালির ভাষাপ্রেম

কৌশিক কর্মকার

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আদতে ইসলামিক জাতীয়তাবাদের নামান্তর ছাড়া অন্য কিছু নয়; যে জাতীয়তাবাদ বাঙালি পরিচয় নিয়ে রীতিমত লজ্জিত। অথচ মজার বিষয় হল এই বঙ্গের একটি গোষ্ঠী মনে করে বাংলাদেশীরাই নাকি বাংলা ভাষার রক্ষক! সত্য হল বাংলাদেশ যে বাংলাকে রক্ষা করবে, তা 'পাক বাংলা', যে বাংলা গড়ে উঠবে 'পূর্ব বাংলায় মোছলমানের খাছ যবানকে বাংলা ভাষায় স্বীকৃতি'র মধ্য দিয়ে।

যেকোন বিষয় সার্থক ভাবে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সংগঠিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। একুশে ফেব্রুয়ারি যে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তার পশ্চাতেও রয়েছে একটি সুসংগঠিত পরিকল্পিত প্রয়াস। কানাডার ভ্যাঙ্কুভার প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিক রফিকুল ইসলাম একুশে ফেব্রুয়ারির 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হয়ে ওঠার পশ্চাতে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ক্রমশ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি দল গঠন করেন; রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করেন ও কালক্রমে ইউনেস্কোর মঞ্চে তাঁদের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়ে ইউনেস্কো যে রেজোলিউশন প্রস্তুত করেছিল সেখানে লিখিত হয় 'Recognising the unprecedented sacrifice made by Bangladesh for the cause of mother language on 21 February 1952.' এবং 'Proposes that 21 February be proclaimed 'International Mother Language Day' throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date on 1952.' আর এই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'র উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হল 'to promote and develop mother tongues'; রাষ্ট্রপুঞ্জের তদানীন্তন মহাসচিব কোফি আন্নানের স্বাক্ষরিত বিবৃতি জানাচ্ছে: 'The United Nations and UNESCO have long worked to promote the dissemination of mother tongues and to advance multilingual education and linguistic diversity.' অর্থাৎ মাতৃভাষা সমূহের প্রসার, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ এই দিবস পালনের উদ্দেশ্যে। তারপর থেকে প্রতিবছর মহাসমারোহে হয়ে পালিত হয়ে আসছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। কিন্তু প্রদীপের নীচে যে অন্ধকার তার খবর কে রাখে? বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ব্যবহৃত ভাষাগুলি সম্পর্কে বাংলাভাষীদের তুচ্ছার্থক মনোভাব সর্বজনবিদিত। দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশে বিশেষত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এই সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস এলাকায়

পরিকল্পিতভাবে চলছে মূল ভূমি থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যমূলক অভিবাসন; যার একমাত্র লক্ষ্য হল এসকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলিকে সংখ্যালঘু করে তাদের ভাষা সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। সদ্যপ্রয়াত বিখ্যাত বাংলাদেশী চিন্তক গোলাম মুরশিদ তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন বাংলাদেশের এ সকল আদিবাসীরা তাঁদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ কিংবা সরকারি কাজকর্ম কোন কিছুই করতে সক্ষম হয় না।[১]

বস্তুত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত আন্দোলনটি ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ, সরকারি চাকরিতে সুবিধালাভ জাতীয় পুরোপুরি কেজো বিষয়কেন্দ্রিক। ইসলামিক সংহতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা যখন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা চালান, তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আসন্ন বিপদ অনুভব করে এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন: 'পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর নানাভাবে পূর্ব বাংলার ভাষাকে মূলধারার বাংলা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছিলো। তার মধ্যে দুটি প্রয়াসের কথা এখানে বলা যেতে পারে- এক. আরবি হরফে বাংলা লেখা এবং দুই. প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ জোর করে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসা। পাকিস্তানের নেতারা আশা করেছিলেন যে, এই দুই উদ্যোগ সফল হলে ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলার ভাষা পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং কালে কালে পূর্ব বাংলার লোকেরা আর মূল বাংলা সাহিত্য পড়তে পারবেন না অথবা পড়বেন না।'[২] তাদের কাছে এই মূল ধারার বাংলা পুরোপুরি হিন্দুয়ানি অধ্যুষিত, তা হিন্দুর ভাষা; এই চিন্তা বহু পূর্ব থেকেই বিকাশ লাভ করেছে পূর্ববঙ্গের মাটিতে। ১১০২ বঙ্গাব্দে জনৈক আব্দুল ওহাব রচিত একটি পুঁথি ছিল ঠিক এরকম:

হনুদ কোশেশ কৈল হইতে তফাত।।
বাঙ্গালা জবান মধ্যে আনিলেক ছারা।
কোফরী শেরেকী বাত ভরিল তাহারা।।
তা দেখি মোজেজ লোকেরা এছলামের।
ছাড়িল সে ভাষা ভাই ঈমান খাতের।।
এছলামে ঈশ্বর বলা কোফরীর জড়।।
এসব কারণে মোরা ছাড়িনু সে ভাষা।
এলাহি দর্বারে আছে মাফির ভরসা।।[৩]

একাত্তরে বাংলাদেশের জন্মের সময় খুব স্বল্প সময়ের জন্য অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটলেও অচিরেই তার স্থান দখল করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বলাবাহুল্য এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আদতে ইসলামিক জাতীয়তাবাদের নামান্তর ছাড়া অন্য কিছু নয়; যে জাতীয়তাবাদ বাঙালি পরিচয় নিয়ে রীতিমত লজ্জিত। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পরবর্তী সময়ে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। উগ্র ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে। দাবি উঠেছে হিন্দু কবির লেখা জাতীয় সংগীত প্রত্যাহারের; কারণ তা 'শিরকে ভরপুর'। অথচ মজার বিষয় হল এই বঙ্গের একটি গোষ্ঠী মনে করে বাংলাদেশীরাই নাকি বাংলা ভাষার রক্ষক! সত্য হল বাংলাদেশ যে বাংলাকে রক্ষা করবে, তা 'পাক বাংলা', যে বাংলা গড়ে উঠবে 'পূর্ব বাংলায় মোছলমানের খাছ যবানকে বাংলা ভাষায় স্বীকৃতি'র মধ্য দিয়ে।[৪] 'পাক বাংলা'র প্রণেতারা আজকে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের স্বরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে।

পুলিশের গুলিতে ভাষা আন্দোলনকারীদের মৃত্যুর প্রতিবাদে দীর্ঘ মিছিল (শিলচর ১৯৬১)।

মানভূম ভাষা আন্দোলনের মিছিল যখন কলকাতায় আছড়ে পড়ে।

অসম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষী অধিবাসীরা সংখ্যাগুরু ছিল। এই অংশটি মূলত বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলার অংশবিশেষ। দেশভাগের সময়েও অসম প্রদেশের অসমিয়া নেতৃত্ব চাননি শ্রীহট্ট ভারতভুক্ত তথা অসম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হোক। স্বাধীনতা উত্তর সময়েও অসমে বাংলা ভাষা বিরোধী একটি আবহাওয়া সদাজাগরূক থাকে। 'অসম প্রদেশ বাঙালিদের অধিকারে চলে যাবে', এহেন প্রচার অসমের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে ১৯৬০ সালে অসমের কংগ্রেস সরকার প্রণয়ন করে 'The Assam Official Language Act, 1960'; যে আইনবলে অসমিয়াকে অসম রাজ্যের 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর বিরুদ্ধে অসমের বাঙালি সমাজ একত্রিত হয়ে গণআন্দোলনের সূচনা করে; গঠিত হয় 'নিখিল আসাম বাংলা ভাষাভাষী সমিতি', 'ভাষা সংরান পরিষদ' এর মত সংগঠনসমূহ। আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ ১৯৬১ সালের ১৩ মে'র মধ্যে বাংলা ভাষাকেও রাজ্যের 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' করার দাবি জানায়। সরকার দাবি না মানলে ১৯ মে তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে। শিলচর রেল স্টেশনের কাছে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালালে এগারোটি তাজা প্রাণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। মাত্র ষোল বছর বয়সী ছাত্রী কমলা ভট্টাচার্য সহ দশ জন মানুষের আত্মত্যাগের

কাহিনি আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। ১৯ মে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন অসমে। তিনি জনসভায় ভাষণ দেন, ভাষা শহীদদের প্রতি কোন সহানুভূতি তো প্রকাশ করেনই না, উপরন্তু তাঁদের 'সরকারি সম্পত্তিতে আগুন লাগানোর কারবারি' বলে দোষারোপ করেন।[৫] আজ পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি জাঁকজমকসহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। তবে উনিশে মে বিরাজ করছে ইতিহাসের উপেক্ষিত এক অধ্যায় রূপে। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন একুশের থেকে কোন অংশে কম নয়, তা আমরা এখনও অনুধাবন করতে পারিনি। আমরা ইতিহাস বিস্মৃত জাতি, কখনোই ইতিহাস সচেতন ছিলাম না, আজও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও একান্তভাবে বাঙালিরই। ১৯১২-১৯৫৬, দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় জুড়ে পরিচালিত হয়েছিল মানভূমের ভাষা আন্দোলন। মানভূম সদর মহকুমা অঞ্চল ছিল একটি বাংলাভাষী অধ্যুষিত এলাকা। স্বাধীনতার সময়ে মানভূম বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১২ সাল থেকেই ভাষিক আধিপত্যবাদের শিকার হয় মানভূম অঞ্চলের বাংলাভাষীরা; বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদান বন্ধ হয়ে আসে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও তাঁরা স্বাধীনতা লাভ করতে অসমর্থ হন। মানভূমে চাকুরিরত বাঙালি আধিকারিকদের বিহারের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয় ইচ্ছাকৃতভাবে; বাধ্যতামূলক হিন্দি শিক্ষার আদেশ প্রেরিত হয়, বাঙালিদের আবাসিক শংসাপত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। এরই প্রতিবাদে মানভূমের বাঙালিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধে ব্রতী হয়। মানভূমের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা কংগ্রেস ছেড়ে লোক সেবক সংঘ গড়ে তোলেন; কারণ কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা কোন প্রতিকার পান না। পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশের মানুষেরও সমর্থন লাভ করেন এই আন্দোলনকারীরা। পুরুলিয়ার নিজস্ব ঐতিহ্য টুসু গান হয়ে ওঠে তাদের আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার: 'শুন বিহারী ভাই/ তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই।/

তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি,/ বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।' ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে মানভূমের পুঞ্চা থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটি দীর্ঘ পদযাত্রার সূচনা ঘটে। তিন শতাধিক কিলোমিটার অতিক্রম করে সত্যাগ্রহীরা সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভাষার অধিকার থেকে কেউ তাঁদের বিচ্যুত করতে পারবে না। ১৯১২-১৯৫৬, দীর্ঘ চার দশকের আন্দোলনের শেষে মানভূম অঞ্চলের বাংলাভাষী এলাকা নিয়ে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর জন্ম লাভ করে পুরুলিয়া জেলা। সদ্যোজাত পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাষার অধিকার ফিরে পান মানভূমের আপামর বাংলাভাষী জনগণ।

উর্দু নয় বাংলা চাই - এই দাবীর জন্য তৃণমূলের বাংলায় পুলিশের গুলিতে শহীদ তাপস বর্মণ ও রাজেশ সরকার।

যে উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতা ১৯৫২-র আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই উর্দুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে খোদ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যে রক্ত ঝরতে পারে, তা ছিল সততই অকল্পনীয়। রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণ, দুই তরুণ কলেজ ছাত্র যারা কেবল দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, পুলিশের গুলিতে তাঁদের মৃত্যু ঘটে ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। স্কুলের ছাত্রদের একমাত্র দাবি ছিল উর্দু নয়, বাংলা ভাষার শিক্ষক চাই। বাংলা ভাষার শিক্ষক চেয়ে যে শিক্ষার্থীকে রাস্তায় নামতে হবে, তা কখনো কল্পনা করা যায়নি। তাদের স্কুলে বিষয় হিসেবে উর্দু পড়ানো হয় না, তাহলে উর্দুর শিক্ষক স্কুলে কেন নিযুক্ত হবেন? তাদের প্রয়োজন বাংলা শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ২০১৮ সালে স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাংলার শিক্ষকের পরিবর্তে পাচ্ছে উর্দুর শিক্ষক। শাসকের এহেন কার্যাবলীই প্রমাণ করে তাঁদের উদ্দেশ্য। গুলি চালানোর পরবর্তী সময়ে পুলিশ বারবার গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করে চলে। অবশেষে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় এন.আই.এ তদন্তের নির্দেশ দেয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ হল একমাত্র ছাত্র সংগঠন যারা শুরু থেকে দাড়িভিটের গুলিবিদ্ধ নিহত ছাত্রদের বিচারের দাবিতে টানা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট তদন্তকে বিপথে চালনার একটি পরিকল্পিত প্রয়াস চলেছে এক্ষেত্রে। আজও চলছে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লড়াই। পাকিস্তানি শাসক উর্দু চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পায়নি। ভাষার প্রতি প্রেম বাঙালির সত্তার অন্তর্গত। তাকে অস্বীকার করে কোন শাসক অব্যাহতি পায়নি, পাবেও না।

তথ্যসূত্রঃ

১। গোলাম মুরশিদ, বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ২০৬
২। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৭
৩। পবিত্র সরকার, ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৮
৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৬০
৫। সুকুমার বিশ্বাস, আসামে ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি-প্রসঙ্গ ১৯৪৭-১৯৬১, পারুল প্রকাশনী প্রা: লি:, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯

শিক্ষায় হতশ্রী

গর্বিত অনুপ্রেরণার পশ্চিমবঙ্গ

বিমল দাস

শ্রীঘরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁকে সঙ্গ দিতে তাঁর সঙ্গীসাথীরা অর্থাৎ অধিকাংশ শিক্ষা দফতরের প্রাক্তন কর্তারাও জেলে। নিয়োগে দুর্নীতির বিষম ধাক্কায় শিক্ষক তো বটেই, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি কর্মীদেরও চাকরি গিয়েছে অনেকের। আর এর প্রভাব পড়ছে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায়। প্রশ্ন উঠছে বাংলায় শিক্ষার কি 'অন্তর্জলি যাত্রার' শুরু?

পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় 'প্রথম স্থান'-এর অধিকারী হওয়ায় আমরা 'গর্বিত'। না ভুল বললাম। আমরা 'গর্বিত বাঙ্গালী'। শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। যা সর্বভারতীয় স্তরে পিছনের দিক দিয়ে বিভিন্ন প্যারামিটারে প্রথম হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্যে ৩,২৫৪টি স্কুলে কোনো শিক্ষার্থী নেই (সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম) এবং ৩,২৬৬টি স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন (সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম)। এমনকি, নবম থেকে দশম শ্রেণিতে স্কুলছুটের হার ১২ শতাংশ ছাড়িয়েছে (সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম)। বাংলার থেকে কম ড্রপ আউট উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানেও। এই ১২ শতাংশ -এর অবধারিত পরিণতি পরিযায়ী শ্রমিক। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ১০০ জন পড়ুয়া নবম থেকে দশম শ্রেণিতে উঠছে, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকছে ৮৮ জন। বাকী ১২ জন পড়ুয়া শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ছিটকে যাচ্ছে। তারা যাচ্ছে কোথায়?

বিশেষজ্ঞদের দাবী, যারা স্কুল ছাড়ছে মানে ১২ শতাংশ সকলেই কাজের তাগিদে হয় শিশু শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগই পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে।

স্থানীয় স্তরে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতায় এই অনুপাত কিন্তু আরও বেশী। তাদের দাবী, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার পরও অনেকে পরীক্ষা দেয় না। তাদের প্রশ্ন, যে জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়, সেই টাকাটা সঠিক লোককে দেওয়া হচ্ছে কি? তাদের আরও দাবী, সেশনের শুরুতে ৩-৪ মাস যত সংখ্যক পড়ুয়া স্কুলে আসছে, ১০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলে সেই সংখ্যা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। সেই কারণেই দেখা যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নাম নথিভুক্তই করছে না ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পড়ুয়া। স্কুলছুট বৃদ্ধি পাচ্ছে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরেও। একাদশ শ্রেণিতে ট্যাবের ১০ হাজার টাকা হাতে পাওয়ার পরও স্কুল ছাড়ছে অনেকে।

কিন্তু কেন এই হতশ্রী অবস্থা

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় উলঙ্গ ভাবে রাজনীতিকরণ।
* শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতার পরিবর্তে টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ।

বাংলায় বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা।

* দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকা।

* বিদ্যালয়ে এক শ্রেনীর শিক্ষকের পাঠদানে অনীহা।

* বর্তমান সময়ের সঙ্গে স্কুলগুলোকে আপডেট করার কোনো নীতি গ্রহন না করা।

* গ্রামের গরিব পরিবারের ছাত্ররা নবম দশম শ্রেণীতে উঠে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়া।

* নিচু শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবারের সঙ্গে কিছু বাড়তি রোজগারের আশায় স্কুলে না গিয়ে কাজে লেগে পড়া।

এই পরিস্থিতিতে বাংলার অভিভাবকেরা যাদের আর্থিক সামর্থ আছে তারা বেসরকারি স্কুলের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। যা সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমার একটি প্রধান কারণ। শিক্ষার মান ও পরিকাঠামোর প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীর্ঘ উদাসীনতা। সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার মান ও পরিকাঠামোর অভাব যা শিক্ষার্থীদের স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করছে। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বাংলা জুড়ে ব্যাপক শিক্ষকের অভাব হয়ে পড়েছে।

অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার গুণগত মান কমছে, যা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও আগ্রহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও স্কুলছুটের পিছনে আছে আরও কিছু কারণ। যেমন - অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল নেই। নবম শ্রেণি থেকে উঠে যাচ্ছে মিড ডে মিল। পড়াশোনার জন্য বাড়ি থেকেও একটা মোটামুটি অঙ্কের খরচ হয়। সেটা পরিবার চালাতে পারছে না। নবম-দশম শ্রেণিতে মিড ডে মিল না দেওয়া হলেও দেওয়া হয় ট্যাবের টাকা ও সবুজ সাথী সাইকেল। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেগুলো ঠিক যায়গায় যাচ্ছে তো? আসলে সবচেয়ে বড় সমস্যা, শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকই যদি না থাকে, তাহলে পড়ুয়ারা কেন যাবে ইশকুলে? তাছাড়া বহু স্কুলে এখনও নেই ভালো পানীয় জল বা ভালো বাথরুম। শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলগুলির এই দশায় ক্ষয় ধরছে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থায়।

সম্ভাব্য প্রতিকার ও সমাধান

স্কুল সংযুক্তিকরণ: রাজ্যে মোট সরকারি স্কুল রয়েছে ৯৩ হাজার ৯৪৫টা। সব থেকে বেশি স্কুল রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি, ৭৯ শতাংশ। প্রাইমারি স্কুল ৯ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরের স্কুল রয়েছে ১১ শতাংশ।

বাড়ছে শিশু শ্রমিক।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, কম শিক্ষার্থীসংখ্যা বা শূন্য শিক্ষার্থীসংখ্যার স্কুলগুলিকে অন্য স্কুলের সঙ্গে মার্জ করা হবে, যাতে পরিকাঠামো ও শিক্ষকের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা যায়।

এখানেই প্রশ্ন , সুষম বন্টন আগে কেন করা হয়নি? কেন অসম বন্টন করে এতদিন চালানো হলো? শিক্ষা মন্ত্রক ও শিক্ষা দপ্তর এতদিন কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো? এখন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার শবযাত্রা সম্পূর্ণ করে সমস্যা থেকে পালানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রীর এটি একটি প্রলেপ বা তাপ্পি দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। এক কথায় জনগণের আই ওয়াশ করার প্রচেষ্টা মাত্র। দ্বিতীয়ত বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপে রাজ্যে বেশ কয়েক হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন: শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সচেতনতা বৃদ্ধি: অভিভাবকদের মধ্যে সরকারি স্কুলের প্রতি আস্থা বাড়াতে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত, যাতে তারা তাদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করতে উৎসাহিত হন।

স্কুলছুট রোধে উদ্যোগ: স্কুলছুটের হার কমাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার নীতি দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে হবে।

*সমস্ত শিক্ষক সমাজকে দায়িত্ব বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে।

*সরকারকে শিক্ষকদের পঠন পাঠনের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে হবে।

*শিক্ষকদের নিজের নিজের বিদ্যালয়ে নিজের সন্তানদের প্রথমে ভর্তির উদ্যোগ নিতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান সমস্যাগুলি সমাধান করা সম্ভব এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। শিক্ষার এই বেহাল অবস্থা থেকে থেকে মুক্তির জন্য সরকারকে দ্রুত কার্যকরী নীতি গ্রহণ বাস্তবায়িত করতে হবে। নচেৎ বাংলার আগামী প্রজন্ম এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে নিমজ্জিত হচ্ছে আরো বেশি করে হবে। বাংলার সচেতন নাগরিক সমাজ ও ছাত্র যুব সমাজকে শিক্ষার এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে বের হবার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।

লেখক বিদ্যাভারতী পরিচালিত হেমতাবাদ সারদা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক।

ফেক নিউজ

দিল্লি নির্বাচনে কেজরির আস্থা ফেক নিউজ

যে কোনো নির্বাচনে বিজেপি বিরোধীদের সব থেকে বড় অস্ত্র ফেক নিউজ আর মিথ্যে প্রপাগান্ডা। নির্বাচনে জিততে মরিয়া আম আদমি পার্টি এবং নির্লজ্জ কেজরি অন্যবারের মতো এবারও মিথ্যে

খবরের ভরসাতেই নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিল। নির্বাচনের দিন ৪ আগে হঠাৎ করে জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হতে থাকে এক নির্লজ্জ মিথ্যাচারের কাহিনী। বিজেপি নাকি দিল্লির দিকে আসা যমুনা নদীতে বিষ দিচ্ছে দিল্লিবাসীর ক্ষতি করতে! বিজেপি শাসিত হরিয়ানা থেকে নাকি এ কাজ করা হচ্ছে বলে প্রচার করতে আরম্ভ করেন খোদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তার ফেক নিউজ টিম।

আসল খবর

যদিও দিল্লি জল বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে এ খবর ১০০% মিথ্যা। দিল্লিতে আসা এবং দিল্লি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমস্ত নদীর জল সবসময় পরীক্ষা করে দেখে তারা। এবং তাতে কখনো কোনরূপ বিষ পাওয়া যায়নি। উল্টে পরীক্ষায় এটা দেখা গেছে যে যমুনা নদীর পবিত্র জলকে নোংরা ও দূষিত করে তা ক্রমাগত ব্যবহারের অযোগ্য করে

চলেছে আম আদমি পার্টি পরিচালিত দিল্লি সরকার।

'গুলনাজ' নিয়ে কংগ্রেসের গুলবাজি

লাভ জিহাদের নামে হিন্দু মেয়েদের সাথে অপকর্ম করা আজকের দিনের জলন্ত বাস্তব। প্রেমের নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হিন্দু মেয়েদের ফাঁসিয়ে ধর্মান্তরিত করা, বিদেশে পাচার করা বা সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়ে খুন করে দেওয়া আজকের ভারতে খুব সাধারণ একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাতে নতুন সংযোজন ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর। হিন্দু মেয়েদের খুন করার পর কেটে ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটরে ভরে রাখার বেশ কিছু ঘটনা সামনে আসছে বিগত কয়েক বছরে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দিল্লি থেকে ব্যাঙ্গালোর বা মুম্বাইয়ের প্রতিটি ঘটনা একটি নির্দিষ্ট যোগসূত্রে বাঁধা।

যেহেতু এরকম প্রতিটি ঘটনা সনাতনী সমাজের বিরূপ প্রভাব ফেলছে তাই একটি নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক সম্পর্কিত

ভোটারদের খুশি করতে এবার ফেক নিউজের সাহায্য নিচ্ছে কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশে ঘটে যাওয়া একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার শিকার 'প্রতিভা'র নাম বদলে 'গুলনাজ' করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করতে আরম্ভ করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

আসল খবর

কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের বিভিন্ন নেতারা এই ফেক নিউজ ছড়াতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে। গুলবাজিকে সত্যি বলে চালিয়ে দিতে পারলে এতে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট ভোটব্যাংককে খুশি করার সুযোগ মিলতো তেমনি ভারতের সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত বলে আবার মরাকান্না শুরু করার সুযোগ

পাওয়া যেত। যদিও পুলিশের তৎপরতায় অপরাধী খুব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার হওয়ায় কংগ্রেসের ফেক চক্রান্ত বিশেষ সফল হয়নি।

মহাকুম্ভ নিয়ে বিরোধীদের মিথ্যা প্রচার

এবারের মহাকুম্ভ শুধু যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাগমের রেকর্ড গড়েছে তাই নয় - প্রয়াগরাজের এই কুম্ভ মেলা দেখিয়ে দিয়েছে মোদী-যোগী প্রশাসন কতটা নিখুঁতভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সরকার চালাতে পারে।

যেহেতু সফলভাবে কুম্ভ আয়োজনের কৃতিত্ব মোদী-যোগী জুটির পক্ষেই যাবে তাই প্রথম থেকেই কুম্ভ মেলাকে বদনাম করার নোংরা খেলায় নেমেছে কংগ্রেস,তৃণমূল, বাম, সমাজবাদী পার্টি সমেত সব বিরোধীরা। বলাই বাহুল্য ফেক নিউজ তাদের প্রধানতম অস্ত্র।

কুম্ভ মেলায় যেতে যাতে সাধারণ মানুষ বিশেষ সাহস না পায় তাই প্রথমেই এভাবে ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে প্রচন্ড ঠান্ডা এবং প্রশাসনের অদক্ষতায় নাকি ১১ জন পুণ্যার্থী মারা গেছে হার্ট অ্যাটাকে।

আসল খবর

পরে যতক্ষণে এই ঘটনায় ক্ষমা চাইছে সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা ততক্ষণে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে গেছে এই মিথ্যে খবর।

পাশাপাশি আবার এটাও বলা হচ্ছিল যে কুম্ভ মেলা নাকি শুধুমাত্র উত্তর ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যদিও কুম্ভ মেলায় আগত শ্রদ্ধালুদের একটা বড় অংশ এসেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। কখনও দুর্ঘটনা, আবার কখনও কন্ডোম বিতরণের মত (২০১৯-এর ভিডিও) নোংরা এবং অশালীন মিথ্যা খবর ছড়িয়ে মানুষকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে গেছে বিরোধীরা। যদিও সাফল্য যে তাতে বিশেষ আসেনি লাগেনি সেটা কুম্ভ মেলায় আগত উন্নতিদের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়।

সইফ আলি নিয়ে ফেক নিউজ ছড়িয়ে ব্যাকফুটে বিরোধীরা

ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য তৃণমূল, বাম এবং কংগ্রেসের ইন্ডিজোট বেশ কিছু বিদেশীকে নিয়োগ করে মাঝে মধ্যে। তাদের

কাজ মূলত রাষ্ট্র এবং বিজেপির বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা খবর ছড়ানো। ইন্ডিজোটের প্রতিটি শরিক এর জন্য বিশেষ টিম বানিয়েছে বলে খবর। এরকমই এক এজেন্টের ছড়ানো দুটি ফেক নিউজের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

শোনা যায় বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খানের উপর নাকি আততায়ীরা হামলা করেছিল তারই বাড়িতে। যদিও ঘটনার পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠে, তবুও এই ঘটনাকে ব্যবহার করে সনাতনীদের বদনাম করতে শুরু করে ইন্ডি জোটের সদস্যরা। বলা হয় আক্রমণকারী নাকি হিন্দু।

আসল খবর

যদিও পরে জানা যায় আক্রমণকারী শরিফুল ইসলাম শেহজাদ শুধু যে অহিন্দু তাই নয়, সে আদতে বাংলাদেশের নাগরিক।

অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে তৃণমূল সরকারের মদতে বিভিন্ন রকম ফেক পরিচয় পত্র বানিয়ে দিব্বি ভারতে বাস করছিল সে।

ট্রাম্পের শপথ ঘিরে বিরোধীদের দুর্বল গুল

ইন্ডি জোটের ভাড়া করা ফেক নিউজ এজেন্সির দাবী ছিল, আম্বানিদের সঙ্গে আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মিটিং করলেও ভারত সরকারের সরকারি প্রতিনিধি নাকি সেখানে কেউ ছিল না।

আসল খবর

যদিও রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ছবি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় একেবারে প্রথম সারিতেই বসে ছিলেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শংকর।

ভারতের ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসের উদযাপনে নয়াদিল্লির কর্তব্যপথ-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

উদ্বোধন শেষে জম্মু ও কাশ্মীরে সোনমার্গ টানেল পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ৩৮তম জাতীয় গেমসের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

গান্ধীজির প্রয়াণ দিবসে নয়াদিল্লির রাজঘাটে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

লোকসভায় ৮ম বাজেট পেশ করার আগে নর্থ ব্লকের বাইরে বাজেট ট্যাবলেট হাতে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন।

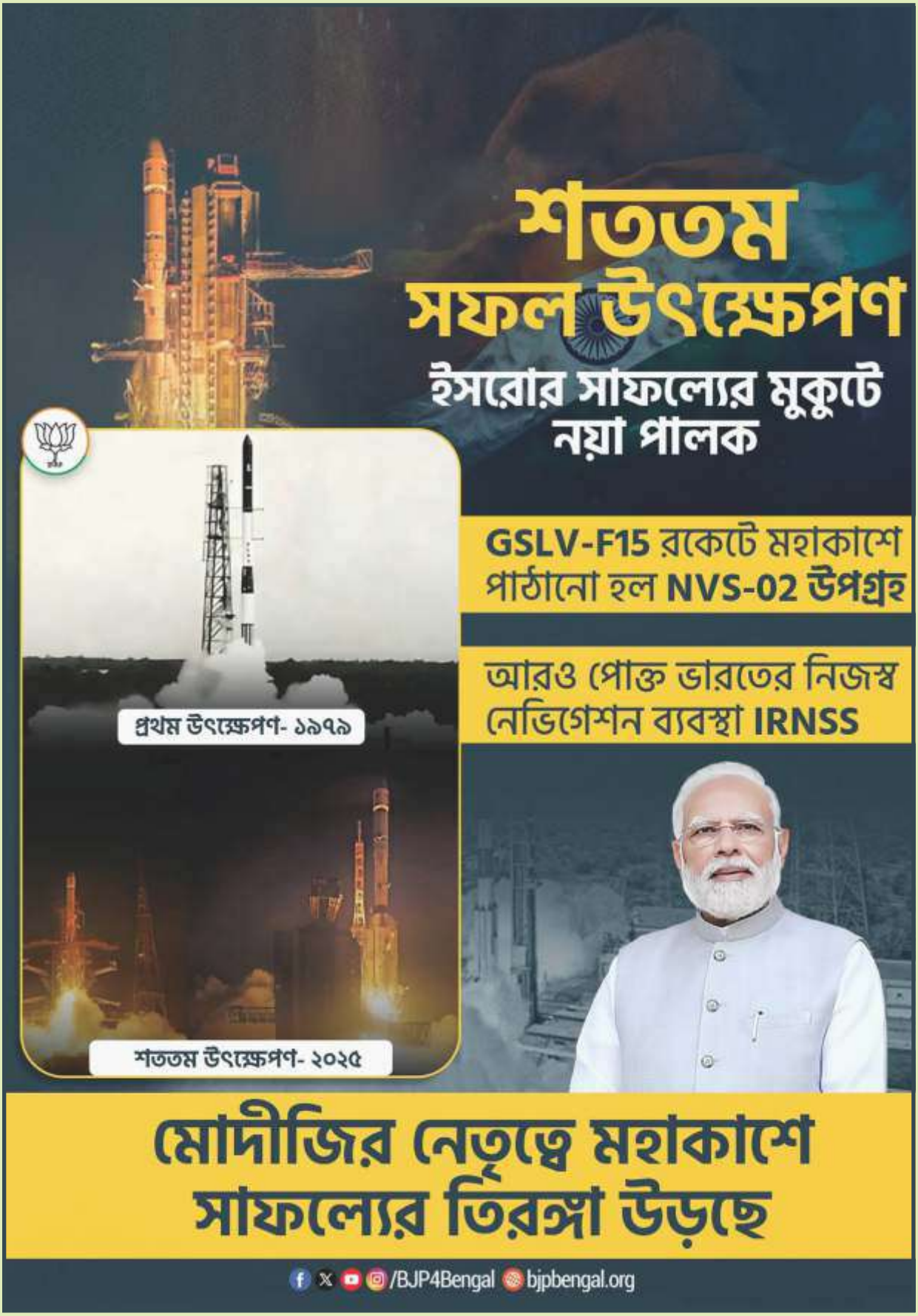

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।